ক্লিন্নতার ঊর্ধে উঠে
এ জয় ভারতীয়
গণতন্ত্রের জয়
— পৃঃ ১২

স্বস্তিকা

মমতার ব্ল্যাক
মেলিং-এর রাজনীতি
আর চলবে না
— পৃঃ ২১

৬৯ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা।। ২৭ মার্চ ২০১৭।। ১৩ চৈত্র - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ২৯ সংখ্যা, ১৩ চৈত্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২৭ মার্চ - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

মণিপুরে ২ শতাশ ভোট পেয়ে পাঁচ বছর পর সরকার গড়লে পশ্চিমবঙ্গে ১৬ থেকে ৩৬ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি বিজেপি করতে পারবে না কেন? ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : জন্ম নিল সাম্প্রদায়িক ভারত ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

ক্লিন্নতার উর্ধ্বে উঠে এ জয় ভারতীয় গণতন্ত্রের জয় ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১২

ভরসাযোগ্য নেতৃত্বের জয় ▯ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ▯ ১৪

হাসিনার ভারত-বিরোধী অভিযোগ বিদ্বেষের রাজনীতির ফল ▯ ১৬

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল ও জাতীয় অর্থনীতিতে তার প্রভাব ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৯

মমতার ব্ল্যাকমেলিং আর চলবে না ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ২১

রাজ্যসভার কং-কমিউনিস্টদের মাতব্বরির দিন শেষ ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৩

বিজেপির শীর্ষতম রাজনৈতিক দল হয়ে ওঠার রহস্য ▯ জয় পণ্ডা ▯ ২৭

দেবী অম্বিকা ▯ বিপ্লব বরাট ▯ ৩১

বাংলার লোকায়ত দেবী দ্বারবাসিনীর বিষহরি ▯ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ▯ ৩২

সুসংহত জীবনবিন্যাস এক পরম্পরাগত অভ্যাস ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ২৯-৩০ ▯ **অঙ্গনা : ৩৪** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** ▯ **অন্যরকম : ৩৬** ▯ **রঙ্গম : ৩৭** ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **স্মরণ : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ইসলামি অশনি সংকেত

পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত ইসলামিকরণ হচ্ছে। আগে এটা করতেন ইসলামপন্থীরা। এখন করছেন হিন্দু রাজশক্তি এবং তাঁদের আজ্ঞাবহ ও কৃপাপ্রার্থীরা। আগামী সংখ্যায় এই বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছেন মোহিত রায়, অমলেশ মিশ্র প্রমুখ।

নববর্ষ সংখ্যা

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর ভবিষ্যৎ

আগামী ১৭ এপ্রিল প্রকাশিত হবে

মূল্য একই থাকছে— ১০ টাকা

সত্বর কপি বুক করুন

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

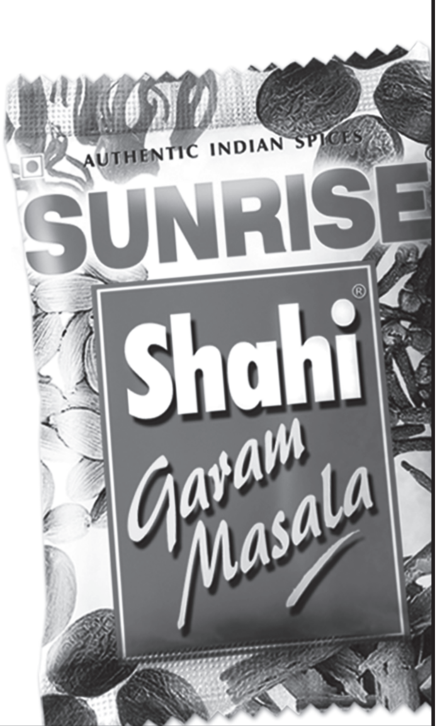

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতীয় রাজনীতির মোড় ঘুরিতেছে

উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফল তথাকথিত সেকুলারবাদীদের দুই গালে দুইটি চপেটাঘাত করিয়াছে। প্রথমটি হইল বিজেপি ঝড়ে কংগ্রেস-সপা-বসপা উড়িয়া গিয়াছে। কংগ্রেস মাত্র ৭টি আসন পাইয়া মোদীর 'কংগ্রেস মুক্ত' ভারত গড়িবার ডাককে নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। দ্বিতীয়টি হইল যোগী আদিত্যনাথকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসানো হইয়াছে। গোরক্ষপুরের মঠের মঠাধীশ হিসাবে যোগী আদিত্যনাথ জাতপাত নির্বিশেষে হিন্দুসমাজের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। তাঁহার হিন্দুত্বের এই ভাবমূর্তিটিকে তুলিয়া ধরিয়া মেকি-সেকুলারবাদীরা বৈষম্যের শিকার হইবার আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্ন হইতে পারে বলিয়া বিতর্কে উস্কানি দিতেছে। সেকুলারবাদীরা নিজেরাই সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ পরিভাষাটির বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছেন। ১৯৯৮-তে তাহাদের দৃষ্টিতে অটলবিহারী বাজপেয়ী উদারবাদী কিন্তু লালকৃষ্ণ আদবানী সাম্প্রদায়িক। ২০১৪-তে আদবানীজী 'অচ্ছা' বা ভালো কিন্তু মোদী সাম্প্রদায়িক। আর এখন যোগী আদিত্যনাথের তুলনায় মোদী ততটা সাম্প্রদায়িক নহেন। সেকু কংগ্রেসী-বামপন্থী-সমাজবাদী রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের ভণ্ডামির কোনো তুলনা নাই।

জাতপাতবাদী বহুজন সমাজ পার্টি 'তিলক তরাজু ঔর তলোয়ার/ইনকো মারো জুতে চার'-স্লোগান দিয়া সমাজকে বিভাজিত করিতে চাহিয়াছিল। ইউপিএ শাসনকালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে দেশের সম্পদের উপর মুসলমানদেরই প্রথম অধিকার। আজ সেকুলার শব্দটির অর্থ একদিকে ধর্মের নামে মুসলমানদের জোটবদ্ধ করানো এবং অন্যদিকে জাতপাতের ভিত্তিতে হিন্দুসমাজকে বিভক্ত করিবার লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ঘটনা হইল যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনেই বলিয়াছেন—তাঁহার সরকার 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর নীতিতেই চলিবে। ঘটনা হইল, এই দেশের তথাকথিত সেকুলারবাদীরা কোনো ব্যক্তি বিশেষের বিরোধী নয়, কিন্তু হাজার বছরের প্রাচীন হিন্দুদর্শন ও ইহার বহুত্ববাদী সংস্কৃতিকে মেকলে-মার্কসবাদী চশমা দিয়া দেখিতে অভ্যস্ত। মূলীভূত ঐক্যেই যে বহুধা বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত—ভারতীয় সংস্কৃতির এই মর্মবাণীই তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ২০১৪ সালের পর হইতে সকল নির্বাচনে দেশের মানুষ সেকুলাবাদীদের এই ব্যাখ্যা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে খারিজ করিয়া চলিতেছে। কংগ্রেস এখন রাজনৈতিক দল হইতে একটি পরিবারকেন্দ্রিক কোম্পানিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। যে দলের একমাত্র লক্ষ্য ধনবলের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল এবং সেই ক্ষমতা বলে আরও অর্থ উপার্জন—আদর্শবাদ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আর ইহার পরিণাম—ইউপিএ শাসনকালে হাজার-লাখ-কোটি টাকার দুর্নীতির কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসিয়াছে। গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রয়োজন। নির্বাচনে পরাজয়ের মাধ্যমে বিরোধী দলগুলি কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছে কিনা ইহার উপরই তাহা নির্ভর করে। কিন্তু ভারতের সর্বাপেক্ষা পুরাতন দল কংগ্রেস আজ গান্ধী-নেহরু পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

২০১৪ সালের এবং সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফলের বার্তা স্পষ্ট। মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দেশবিরোধী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে দেশের মানুষ কোনো ভাবেই আর সহ্য করিতে রাজি নহে। কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধী দলগুলিকে বুঝিতে হইবে ১৯৭০-৮০ সময়ের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী স্লোগান এখন চলিবে না। জাতীয় সুরক্ষা, স্বাভিমান, জনজীবনে স্বচ্ছতা, 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'-ই ক্ষমতা লাভের মন্ত্র—পাসওয়ার্ড। ভারতীয় রাজনীতির এখন মোড় ঘুরিতেছে। সুপরিবর্তনের বাতাস বহিতেছে। এই পরিবর্তন স্বাগত।

সুভাষিতম্

গবাম্ অনেক বর্ণানাং ক্ষীরস্য অপি একবর্ণতা।

ক্ষীরবৎ পশ্যতে জ্ঞানং লিঙ্গিনঃ তু গবাং যথা।। (উপনিষদ)

গাভীসকল নানাবর্ণের হলেও সকলের দুধ একই বর্ণের হয়। সেরূপ প্রাণীসমূহ গাভীর মতো ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের হৃদয়স্থিত ব্রহ্মজ্ঞান দুধের মতোই একরূপ হয়।

সংবাদ প্রতিবেদন

ইসলামি মৌলবাদীদের সন্ত্রাস নিয়ে মূক তৃণমূল সরকার : আর এস এস

প্রতিনিধিসভায় সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত এবং সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি মৌলবাদীদের বেপরোয়া আক্রমণ নিয়ে রাজ্য সরকার নীরব দর্শক এবং 'জেহাদি'দের সঙ্গে আপোশ করছে বলে আর এস এস অভিযোগ করেছে। সম্প্রতি আর এস এসের সহ-সরকার্যবাহ ভি ভাগাইয়া জানিয়েছেন, আর এস এসের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় পশ্চিমবঙ্গে গত তিন বছর ধরে ইসলামি মৌলবাদীদের 'বেপরোয়া সন্ত্রাস' নিয়ে চর্চা হয়েছে এবং এই মর্মে একটি প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হয়েছে। সমাজের উপর 'জেহাদি' আক্রমণের প্রতিরোধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মৌলবাদীদের সন্ত্রাস রুখতে রাজ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির কথা সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১৯, ২০ ও ২১ মার্চ, তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক হয়ে গেল। সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত ও সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী (ভাইয়াজী) এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সারা দেশ থেকে প্রদেশ ও তদূর্ধ্ব স্তরের প্রায় ১৪০০ কার্যকর্তা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী ভাগাইয়ার অভিযোগ, রাজ্যের তৃণমূল সরকার আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা তো গ্রহণ করছেই না, উপরন্তু তাদের প্রশ্রয় দিয়ে আপোশের নীতি গ্রহণ করেছে। রাজ্যের অনেক জায়গায় জেহাদিরা সরস্বতী পূজা বন্ধ রাখতে বাধ্য করছে, পরিবর্তে 'মিলাদ-উদ-নবি' দিবস পালনে উৎসাহ দিচ্ছে। এরা এতটাই বেপরোয়া যে থানা আক্রমণ করতেও পিছপা হচ্ছে না যা জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বার্থের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সিউড়িতে চৈতন্য জয়ন্তীতে পুলিশের বাধা

পার্থসারথি সাধু ॥ পুলিশ প্রশাসনের স্বৈরাচারী মনোভাব দেখা গেল গত ১২ মার্চ সিউড়ি শহরে। সেদিন ছিল হিন্দুদের পবিত্র দোল উৎসব। একই দিনে ছিল চৈতন্য উৎসব তথা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মজয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ বীরভূম জেলা শাখা মহাপ্রভুর জন্মজয়ন্তীর আয়োজন করে সিউড়ি শহরে। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে নগর পরিক্রমা ইত্যাদির আয়োজন করে আগাম জেলা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে দেওয়া হয়। কোন রাস্তা ধরে শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমা করবে সেটাও জানানো হয় পুলিশকে। জেলার সাংস্কৃতিক মনোভাব সম্পন্ন প্রায় পাঁচ শতাধিক তরুণ, যুবক জমায়েত হন শহরে। প্রত্যেকের হাতে-হাতে গৈরিক পতাকা শোভা পেতে থাকে এবং মুখে-মুখে ধ্বনিত হতে থাকে জয় শ্রীরাম, হরে-রাম, হরে-কৃষ্ণ ধ্বনি। সিউড়ি শহরের আকাশ-বাতাস মুখরিত হতে থাকে জয়ধ্বনিতে। শহরের মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় স্বতঃস্ফূর্ততা। হঠাৎ এই আনন্দের মাঝে ধেয়ে আসে পুলিশের চোখ রাঙানি এবং পথরোধ। মৌমাছি ক্লাবের কাছাকাছি আসতেই পুলিশের হুঙ্কার শোভাযাত্রা না করার। পুলিশ জানায় মাদ্রাসা রোড দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না শোভাযাত্রা। কারণ সেখানে থাকেন শান্তির দূতেরা। তাঁদের এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়া যাবে না। সিউড়ি শহর পরিক্রমা করতে হলে মাদ্রাসা রোড বাদ দিয়ে করা যায় না। বিকল্প রাস্তায় পরিক্রমা করতে হলে কয়েক কিলোমিটার ঘুরে পরিক্রমা করতে হয়, যা প্রায় অসম্ভব। স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণের প্রশ্ন, পুলিশকে আগাম জানানো সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসন আগে থেকে কেন আয়োজকদের জানায়নি যে মাদ্রাসা রোড হয়ে যাওয়া যাবে না? সিউড়ির মাদ্রাসা রোডে কী এমন বস্তু আছে যার জন্য পুলিশ এই রাস্তাটিকে এড়িয়ে যেতে বলেছে। তাহলে কি শাসক দল আর পুলিশের মদতেই এই রাস্তা ও সংলগ্ন এলাকায় অবৈধ, বেআইনি কার্যকলাপ চলছে? সিউড়ি পুলিশের এহেন ভূমিকায় সিউড়িবাসী-সহ জেলার মানুষ ক্ষুব্ধ।

উত্তরাখণ্ড হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়

গঙ্গা-যমুনা শুধু নদী নয়, জীবন্ত সত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গঙ্গা যমুনা এবং তাদের অববাহিকা অঞ্চল ও শাখানদীগুলি ভারতীয়ত্বের জীবন্ত সত্তা। একজন ভারতীয় নাগরিক যে অধিকার ভোগ করেন, রাষ্ট্রের কাছে যে নিরাপত্তা পান তার সবই নদীদুটির পাওয়া উচিত। সম্প্রতি উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট একটি ঐতিহাসিক রায়ে এই কথা বলেছে। রায় দেবার সময়

বিচারপতি অলক সিংহ

বিচারপতি রাজীব শর্মা

আদালত অগ্রাধিকার দিয়েছে নদী দুটির 'সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ' এবং 'সাধারণ মানুষের আবেগ'কে। বিচারপতি অলক সিংহ এবং রাজীব শর্মাকে নিয়ে গঠিত যৌথ বেঞ্চ বারো পাতার রায়ে জানিয়েছে, 'গঙ্গা-যমুনার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ায় এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এখন ব্যতিক্রমী কিছু করা দরকার।' গঙ্গা-যমুনার দূষণ রোধে কর্মরত প্রত্যেকেই এই রায়ে খুশি। তাঁদের বক্তব্য, এখন থেকে নদীর ক্ষতি এবং একজন জীবন্ত মানুষের ক্ষতি একই তাৎপর্য বহন করবে।

জঙ্গিদের রুট বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, জঙ্গিরা তাদের কাজের পদ্ধতি অনেকটাই পালটে ফেলেছে। বদলে গেছে তাদের ভারতে প্রবেশ ও প্রস্থানের রুট। এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে মূলত খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর।

এক সরকারি আধিকারিকের বক্তব্য অনুযায়ী, 'আগে জঙ্গিরা মালদা, মুর্শিদাবাদ আর নদীয়া জেলার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করত। আমরা এরকম ১৪টি রুট চিহ্নিত করেছি যেখান দিয়ে জঙ্গিরা সচরাচর ভারতে ঢুকত। কিন্তু এখন তারা অসম আর ত্রিপুরা সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে ভারতে ঢোকে। তারপর তাদের গন্তব্য হয় পশ্চিমবঙ্গ।'

ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, মালদহ-চাপাই-নবাবগঞ্জের চেনা পথ ছেড়ে জঙ্গিরা এখন বাংলাদেশের সিলেট থেকে বরাক উপত্যাকা ও নদী পেরিয়ে হয় মেঘালয় নয়তো অসমে প্রবেশ করে। তারপর আসছে পশ্চিমবঙ্গে। আর একটি জঙ্গি রুট হলো ব্রাহ্মণবেড়িয়া বা ময়মনসিংহ বা চট্টগ্রাম হয়ে ত্রিপুরা।

পশ্চিমবঙ্গ অসম, ত্রিপুরায় : জঙ্গি অনুপ্রবেশ আকস্মিক বৃদ্ধি

নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি জঙ্গির সংখ্যা ২০১৬ সালে হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরে রিপোর্টটি পাঠিয়ে দিয়েছে। জানা গেছে, ভারতে অনুপ্রবেশকারী হরকত উল জিহাদি আল ইসলামি (হুজি) এবং জামাত-উল-মুজাহিদিন জঙ্গির সংখ্যা ২০১৬ সালে প্রায় তিন গুণ (২০১৫-র তুলনায়) বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমান্তে প্রহরা আরও দুর্ভেদ্য করার জন্য তিনটি রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর।

রিপোর্টে অনুপ্রবেশকারী জঙ্গির সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা না হলেও আনুমানিক ২০১০ জন হুজি এবং জেএমবি জঙ্গি তিন রাজ্যের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে জঙ্গিরা ছাড়া রয়েছে লিঙ্কম্যানেরাও। অনুমানিক ৭২০ জন আশ্রয় নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বাকি ১২৯০ জন অসম ও ত্রিপুরায়। এই প্রসঙ্গে, রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'জঙ্গি অনুপ্রবেশ বেনে গেছে বলে যে রিপোর্ট এসেছে আমরা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই। কারণ খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের পর সীমান্তে প্রহরা বাড়ানো হয়েছে। আমাদের শীর্ষ আধিকারিকেরা সীমান্তরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। আমরা এই বিষয়ে আরও সুনির্দিষ্ট তথ্য জোগাড় করার চেষ্টা করছি।' পশ্চিমবঙ্গের হাল এরকম হলেও অসম স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'গত ছ'মাসে নিঃসন্দেহে জঙ্গি অনুপ্রবেশ বেড়েছে। আমরা ৫৪ জন জে এম বি-জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছি। এই তথ্য থেকেই প্রমাণিত বাংলাদেশ সরকারের পাঠানো রিপোর্ট মিথ্যে নয়।'

বিদেশি অর্থ সংগ্রহে শীর্ষে খ্রিস্টান এনজিও

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চলতি অর্থবর্ষে কেরলকেন্দ্রিক এনজিও আয়ানা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহ করে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। খবরে প্রকাশ, এই সংস্থার মাধ্যমেই আমেরিকার এনজিও গসপেল ফর এশিয়া ভারতে নিজের অ্যাজেন্ডা চালাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের লিস্টে তৃতীয় এবং চতুর্থস্থানে রয়েছে আরো দুটি খ্রিস্টান এনজিও— বিলিভারস্ চার্চ ইন্ডিয়া ও ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়া। চলতি বছরে তাদের সংগ্রহ যথাক্রমে ৩৪২ কোটি এবং ৩১৯ কোটির কিছু বেশি। উল্লেখ্য ট্রেক্সাসকেন্দ্রিক এনজিও গসপেল ফর এশিয়া কানাডায় আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে আগেই বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। ভারতেও ধর্ম পরিবর্তন-সহ বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক সংহতি নষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে এই সংগঠনটির বিরুদ্ধে। বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহকারী এনজিওগুলিকে এফসিআরএ-তে রেজিস্ট্রেশন নিতে হয় এবং প্রতি বছর রির্টান দাখিল করে তাদের অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ ও উৎস কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে জানাতে হয়। সেই রিটার্ন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আয়না চ্যারিটেবল ট্রাস্ট-এর সংগৃহীত বেশিরভাগ অর্থই এসেছে গসপেল অব এশিয়ার হংকং কেন্দ্র থেকে। বৈদেশিক তহবিল সংগ্রহের তালিকায় থাকা তৃতীয় এনজিও বিলিভারস্ চার্চ ইন্ডিয়ার দেওয়া তথ্য আরো আশ্চর্যের। দাখিল করা রিটার্ন অনুযায়ী বৈদেশিক সংগ্রহ ৩৪২.১ কোটি হলেও তাদের এই ২০১৫-১৬-তে মোট সংগ্রহের পরিমাণ ৮৪২ কোটি। অতিরিক্ত ৫০০ কোটি তারা সংগ্রহ করেছে এফসিআরএ রেজিস্টার্ড অন্য সংস্থাগুলি থেকে যারা সরাসরি বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আমলাদের মতে বিষয়টি কখনই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়, তদন্ত শুরু হয়েছে, আগামীদিনে আরও তথ্য উঠে আসবে বলে তাদের আশা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কানাঘুষো, কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে পড়ে। কারণ আগেই ধরা পড়েছে যে বিলিভারস্ চার্চ ইন্ডিয়াকে বড় রকমের অর্থ সাহায্য করে গসপেল ফর এশিয়া। ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সর্বাধিক অর্থ সংগ্রহকারী ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়া এবছর চতুর্থ স্থানে সরে গেছে।

প্রথম হিন্দু সংগঠন

চলতি অর্থ বছরে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহে দ্বিতীয় হয়ে নিন্দুকদের চমকে দিল হিন্দু সংগঠন পরম শক্তিপীঠ। তাদের

সংগৃহীত মোট অর্থ ৪১৭.৯ কোটি। সাধ্বী ঋতম্বরা পরিচলিত বৃন্দাবনকেন্দ্রিক এই সংগঠন মহিলা, শিশুদের মধ্যে কাজ করছে। হাসপাতাল, অনাথালয় সহ বেশ কয়েকটি গোসেবা কেন্দ্র চালায় এই সংগঠন।

জাকিরের বিরুদ্ধে ফের সমন এন আই এ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জঙ্গি কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ মদতদাতা জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে নতুন করে সমন জারি করল জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এন আই এ। এই নিয়ে উপর্যুপরি দু'দুবার। প্রথমবারের সমনে গত ১৪ মার্চ তদন্তকারীদের সামনে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল জাকিরকে। কিন্তু জাকির তা উপেক্ষা করায় তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় সমন জারি করে আগামী ৩০ মার্চের মধ্যে সন্ত্রাস-বিরোধী আইনে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হলো তাকে। গত বছর ঢাকায় সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় তার বক্তৃতা শুনে কয়েকজন জঙ্গির সন্ত্রাসে প্ররোচিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল জাকিরের বিরুদ্ধে। তারপরেই গ্রেপ্তারি এড়াতে মুম্বইয়ের বাসিন্দা জাকির সৌদি আরবে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তবে শুধু ঢাকার গুলশন বেকারির ঘটনাতেই নয়, চিকিৎসক তথা জঙ্গি আদর্শবাদের প্রচারকারী ইসলামি নেতা জাকির বিভিন্ন সময়ই এমন সব মন্তব্য করেছে যাতে করে তার বিরুদ্ধে ইউপিএ-র ধারায় মামলা করাই যেতে পারত।

কিন্তু ভারতবর্ষের পূর্বতন শাসক দল ও তার সহযোগীরা সংখ্যালঘু তোষণের মানসিকতায় জাকিরের বিরুদ্ধে এতদিন টুঁ শব্দটিও করেনি প্রশাসন। কিন্তু মোদী সরকার এ ব্যাপারে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। ইউপিএ-র ধারায় ডোংরিতে জাকিরের এনজিও ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্ট সম্প্রতি ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে। এবং এর সভাপতি ও সদস্যরা যে বে-আইনি কার্যকলাপে যুক্ত তার উল্লেখও করেছে। জাকির নায়েকের সংগঠন আমেরিকা, কানাডা ও মালয়েশিয়ার মতো দেশেও নিষিদ্ধ।

নন্দীগ্রামে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব, শিক্ষক প্রহৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আরও একবার ধর্মের জিগির তুলে স্কুলে তাণ্ডব চালাল মুসলমান দুষ্কৃতীরা। এবার ঘটনাস্থল নন্দীগ্রামের সামসাবাদ বিদ্যাপীঠ। খবরে প্রকাশ, কিছুদিন আগে প্রধান শিক্ষক পবিত্র মাইতি স্কুলের মুসলমান ছাত্রদের মাথায় ফেজটুপি পরে আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, এটা একটা স্কুল, মাদ্রাসা নয়। সুতরাং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর নির্দিষ্ট স্কুল-ইউনিফর্ম পরে স্কুলে আসা উচিত। ছাত্রছাত্রীরা সকলে মেনেও নিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি আবার মুসলমান ছাত্ররা ফেজটুপি এবং মেয়েরা হিজাব-পরিহিত হয়ে স্কুলে এলে প্রধান শিক্ষক তার প্রতিবাদ করেন। এরপরেই তুলকালাম বেঁধে যায়। মুসলমান অভিভাবক এবং স্থানীয় মৌলবাদী মুসলমানেরা স্কুলে হামলা চালায়। চেয়ার টেবিল কম্পিউটার ভাঙা হয়। প্রধান শিক্ষক পবিত্র মাইতি বেধড়ক মার খান। স্কুলের বাথরুমের দরজা পশ্চিমদিকে হওয়ার অভিযোগে হামলাকারীরা বাথরুমটাও ভেঙে ফেলে। খবর পেয়ে পুলিশের বড়কর্তারা, মুসলমান সমাজের মওলানা এবং জামাত ইসলামের নেতারা হাজির হন। প্রধান শিক্ষক নিঃশর্তে ক্ষমা চান। মুসলমানদের দাবিও সব মেনে নেওয়া হয়। দাবিগুলি এই রকম, (১) মুসলমান ছাত্ররা ফেজটুপি এবং ছাত্রীরা হিজাব পরে স্কুলে আসতে পারবে, (২) প্রতি শুক্রবার ছাত্রদের নমাজ পড়ার জন্য এক ঘণ্টা ছুটি দিতে হবে, (৩) স্কুলে নবি দিবস পালিত হবে এবং (৪) বাথরুম ভেঙে উত্তরমুখী দরজা বসাতে হবে। সূত্রের খবর, এ ঘটনায় স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। যে-কোনো সময়ে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে।

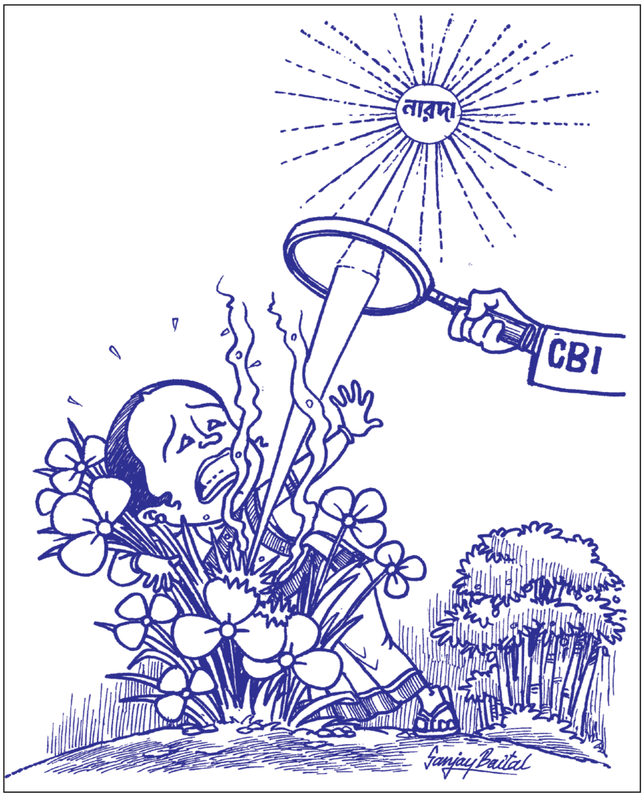

উবাচ

“কৌশলগত অংশীদারের অর্থ এই নয় যে আমরা আমাদের জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে আপোশ করব।”

সুষমা স্বরাজ
কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী

আমেরিকায় দু'জন ভারতীয়ের হত্যা প্রসঙ্গে।

“আমাদের আশা এবং পূর্ণ বিশ্বাস যে মহন্ত আদিত্যনাথ আমাদের নিজেদের ভারত তৈরি করবে। ভারত যেখানে হিন্দুরা সবসময়ে নিরাপদ ও উন্নতিশীল। আমাদের সমর্থন সবসময় তাঁর পাশে থাকবে।”

প্রবীণ তোগাড়িয়া
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে অভিনন্দন প্রসঙ্গে।

“প্রধানমন্ত্রী মোদী ক্ষমতা কুক্ষীগত করছেন বলে কেউ কেউ অভিযোগ করলেও আমি মনে করি, নীতি আয়োগ এবং জিএসটি-র ক্ষেত্রে তিনি বরং এর বিপরীতটাই করেছেন এবং প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তুলতে চেষ্টা করছেন।”

মেহবুবা মুফতি
জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী

ইন্ডিয়া টু ডে কনক্লেভ ২০১৭-তে ভাষণে।

“এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের সব থেকে শক্তিশালী নেতা। সম্ভবত সারা বিশ্বেরও। তিনি যদি তামিলদের প্রতি সুবিচার না করেন তাহলে পৃথিবীতে আর কারও তা করার ক্ষমতা নেই।”

ভি. ম্যাট্রিয়েন
এ আই এ ডি এম কে-র নেতা

তামিলনাড়ুর উন্নয়ন এবং তামিলদের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে।

“উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখাটাই আমার অগ্রাধিকার।”

যোগী আদিত্যনাথ
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

উত্তরপ্রদেশের নবনির্বাচিত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে।

মণিপুরে ২ শতাংশ ভোট পেয়ে পাঁচ বছর পর সরকার গড়লে পশ্চিমবঙ্গে ১৬ থেকে ৩৬ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি বিজেপি করতে পারবে না কেন?

দেশের বৃহত্তম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহান্ত যোগী আদিত্যনাথ এবং হিমালয়ের দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিংহ রাওয়াতকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। সম্প্রতি যে পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে তার চারটিতে বিজেপি সরকার গঠন করেছে। তবে একক নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতায় সরকার গড়া সম্ভব হয়েছে উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে। অন্য দুটি রাজ্য গোয়া ও মণিপুরে বিজেপির নেতৃত্বে জোট সরকার হয়েছে। ভবিষ্যতে এই দুটি রাজ্যেও বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে একাই সরকার গড়বে এমন আশা করাই যায়। দেশাত্মবোধ, হিন্দুত্ব ভাবধারা এবং উন্নয়ন এখন থেকে চলবে পরস্পরের হাত ধরে। দেশের রাজনীতির চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করে উত্তরপ্রদেশ। যে দল উত্তরপ্রদেশ থেকে সর্বাধিক সাংসদ কেন্দ্রে পাঠায় সেই দলই দেশের সরকার গড়ে। গত ২০১৪ সালে লোকসভার নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের সর্বাধিক আসনে বিজেপি প্রার্থীরাই জয়ী হন। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠিত হয়েছে। যতদিন এই উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের প্রাধান্য ছিল ততদিন নেহরু-গান্ধী পরিবার ভারত শাসন করেছে। গান্ধী পরিবারের শেষ দুর্গ ছিল আমেথি লোকসভা কেন্দ্রটি। এই কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বিধানসভায় কংগ্রেস পরাজিত। জয়ী বিজেপি।

এই প্রেক্ষিতে বিচার করলে ২০১৯-র লোকসভা ভোটে বিজেপির বিপুল জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। শুধু উত্তরপ্রদেশ কেন, দেশের প্রতিটি রাজ্যের মানুষ চান উন্নয়ন হোক। বাড়ির বেকার ছেলেমেয়েরা কাজ পাক। দারিদ্র্য মোচনকারী প্রকল্পগুলি মানুষের স্বার্থে কাজ করুক। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। হিন্দুত্ব ভাবধারা এবং দেশপ্রেম একই মুদ্রার দুই পিঠ। বামপন্থীরা হিন্দুত্বের মধ্যে ধর্মীয় বিভাজনের গন্ধ পায়। কারণ, তারা বেদ, পুরাণ, গীতা এবং মহাভারত পাঠ না করে বিদেশ থেকে আমদানি করা মার্কস, অ্যাঙ্গেলস রচিত কাল্পনিক সমাজ ব্যবস্থার পাঠ নিয়েছেন। স্বদেশের ঠাকুর ফেলে তাঁরা বিদেশের কুকুর মাথায় নিয়ে নাচতে ভালবাসেন। এদের চরিত্র দেশের মানুষ বুঝে গেছেন। তাই আজ দেশের রাজনীতিতে কমিউনিস্টরা ব্রাত্য। এরপর তাঁদের লাল দুর্গে লালবাতি জ্বলবে। বাম রাজনীতি দেউলিয়া হয়ে যাবে।

গূঢ় পুরুষের কলম

উত্তরপ্রদেশ-উত্তরাখণ্ডের ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী লোকসভার নির্বাচনকে পাখির চোখ করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দলকে বার্তা দিয়েছেন, ২০১৯-এর জন্য তৈরি হতে। তিনি দলীয় সাংসদদের বলেছেন, 'না হাম চুপ ব্যয়ঠে রহেঙ্গে, না আপকো চুপ ব্যয়ঠনে দেঙ্গে।' মোদীজীর কথায় স্পষ্ট যে দলে আত্মসন্তুষ্টির স্থান নেই। উত্তরপ্রদেশের সাফল্যে বুঁদ হয়ে থাকার বদলে পরের লক্ষ্যের জন্য ছুটতে হবে। আপাতত দুটি লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমত, সরকারের কাজের দূত হিসাবে তরুণদের নিয়োগ করতে হবে। উত্তরপ্রদেশের ভোটের প্রচারের সময় নোটবন্দি নিয়ে কংগ্রেসের অপপ্রচারের জবাব দিতে যুববাহিনী নিয়োগ করে সাফল্য পেয়েছিল বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনেও সেই কৌশল নিতে চান প্রধানমন্ত্রী। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকার যে 'ভীম অ্যাপ' বানিয়েছে তা ছোট ব্যবসায়ীদের কাছে জনপ্রিয় করতে সপ্তাহব্যাপী প্রচারে জোর কদমে নামতে হবে বিজেপি-সাংসদ ও বিধায়কদের। বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস ৬ এপ্রিল থেকে আম্বেদকরের জন্মদিন ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত ভীম অ্যাপের প্রচারাভিযান চলবে। ভীম অ্যাপের প্রচার একদিকে আম্বেদকরকে স্মরণ, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর 'লেস ক্যাশ' ব্যবস্থা চালু এই দুই কাজ করবে। মনে রাখতে হবে এবার উত্তরপ্রদেশ ভোটে দলিতদের ভোট পাওয়ায় দল ঐতিহাসিক সাফল্য পেয়েছে।

সব কিছু ঠিকঠাক চললে পশ্চিমবঙ্গেও লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বড় রকমের সাফল্য পাবে। আগের বার মাত্র ২টি আসনে জিতেছিল বিজেপি। তার মধ্যে দার্জিলিংয়ের আসন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সৌজন্যে। বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বে থাকা কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেছেন, মণিপুরে বিজেপি যদি ২ শতাংশ ভোট পাওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে সরকার গড়তে পারে তবে পশ্চিমবঙ্গে ১৬ শতাংশ ভোট থেকে ৩৬ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি করতে পারবে না কেন? হ্যাঁ, এই বিশ্বাসটা মনের মধ্যে রাখতে হবে। রাজ্যের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতা, চিটফান্ড দুর্নীতি এবং নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ রাজ্যের মানুষজনকে তৃণমূল বিরোধী করে তুলেছে। এর প্রমাণ, মোদীজীর নোটবন্দির বিরোধিতায় তৃণমূল নেত্রী পথে নেমে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করেছেন। বাংলার মানুষ সাড়া দেননি। তাঁরা মোদীজীকে বিশ্বাস করেছেন। আস্থা রেখেছেন। কালোটাকার রমরমা বন্ধে তাঁরা মোদীজীর পাশেই থেকেছেন। তৃণমূল নেত্রীর উস্কানিতে প্ররোচিত হননি। তাই বলছি, লোকসভার ২টি আসনকে আগামী নির্বাচনে ২০টি করা আকাশ কুসুম কল্পনা নয়। শুধু দরকার আত্মবিশ্বাস এবং সঠিক প্রচার কৌশল। বিজেপির সামনে এরপর ছত্তিশগড়, গুজরাত, রাজস্থান, হিমাচল ও মধ্যপ্রদেশের ভোট। এই পাঁচটি রাজ্যেই দলের মজবুত সংগঠন আছে। এই রাজ্যগুলিতে ভোটের মূল লড়াইটা হবে কংগ্রেসের সঙ্গে। পাঁচটিতেই কংগ্রেস হারালে দল নিশ্চিহ্ন হবে। গান্ধী পরিবারকে পাততাড়ি গুটিয়ে দিল্লি থেকে পালাতে হবে। বিজেপির নয়, কংগ্রেস কর্মীদের তাড়া খেয়ে। আক্ষরিক অর্থেই পাঁচ রাজ্যের ভোট সোনিয়া- রাহুলের কাছে বাঁচার লড়াই। ■

জন্ম নিল সাম্প্রদায়িক ভারত

প্রিয় সেকুলার ভাই ও বোনেরা,

কান্নায় বুক ফেটে যাচ্ছে। গেরুয়া রঙের আগুন দেখে চোখ জ্বলে যাচ্ছে।

সত্যি আপনাদের কষ্ট বুঝতে পারছি। একজন মৌলবি কিংবা পাদরি যদি ক্ষমতার শীর্ষ বসতেন তবেই না আপনাদের শান্তি হোত! কিন্তু শেষে কী হলো একজন গেরুয়াধারী কিনা ভারতের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাও আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। মনে পড়ে যাচ্ছে সেই প্রাচীন ভারতের কথা। যখন সন্ন্যাসীরাই রাজাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। শেষে কিনা গোটা দেশে সাম্প্রদায়িক আর এস এস-এর স্বপ্ন সম্ভব হয়ে গেল!

আপনাদের জন্য আরও কষ্ট হচ্ছে এই ভেবে যে, সেই গেরুয়াধারীর ক্ষমতার শীর্ষে ওঠার পিছনে কোনো সাম্প্রদায়িক উস্কানি নেই। কোনো ভেদভাব নেই। সে কিনা উন্নয়নের কথা বলে জেতা সরকারের প্রধান! সত্যিই এ এক আশ্চর্য সমাপতন। না সমাপতন নয়, শুরু। গোটা দেশটার রঙই যে এবার বদলে যাবে। আর সেটা কিনা চাইছে সবথেকে বড় রাজ্যের সবথেকে বেশি মানুষ। যাদের আবার বড় অংশ মুসলমান। আর গোটা দেশে দু'হাত তুলে সেই সরকারকে অভিবাদন জানাচ্ছে। সেকুলারত্বের তো কিছুই রইল না! গান্ধী নেই। দেশ জুড়ে শুধুই মোদী! সর্বত্র শুধু আর এস এস, আর এস এস জয়ধ্বনি?

কাঁদবেন না। খবরের কাগজের পাতা ভিজে যাবে। বরং এই নির্বাচনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। মোদীর ভারত জয়ের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

সদ্য অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া গণতন্ত্রের উৎসবের দিকে তাকিয়ে দেখুন। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের দিকে নজর ছিল গোটা বিশ্বের। একে তো দেশের বৃহত্তম রাজ্য। তার উপর সেখানে ১৯ শতাংশ মুসলমান, ২১ শতাংশ দলিত এবং ৪০ শতাংশ পিছিয়ে-পড়া গোষ্ঠী। বছরের পর বছর ধরে এই রাজ্যের মানুষের এক-একটি বর্গ একেক রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয়। বলা যায়, আইডেনটিটি পলিটিক্সের একেবারে আঁতুড়ঘর এই রাজ্য। তাই সেখানে মোদীর উন্নয়ন মডেল কতটা কাজ করে আর অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরই বা কী ভূমিকা, তা নিয়ে গোটা বিশ্বের কৌতূহল ছিল তুঙ্গে।

ফলাফলে পরিষ্কার, গণতন্ত্রের এই খেলায় মোদীই সফল জাদুকর। শুধু উত্তরপ্রদেশই নয়, অন্যান্য রাজ্যের ফলাফলও নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের নির্বাক করে দিয়েছে। এই মুহূর্তে উন্নয়ন রাজনীতিতে জাদু দেখাচ্ছেন মোদী। ক্যারিশমা এবং উন্নয়নের জাদু দিয়ে যিনি ঘুচিয়ে দিয়েছেন মানুষের সমস্ত অভাববোধ। সাধারণ মানুষের ধারণা তৈরি হয়েছে, তিনিই দিন বদলাতে পারবে না। সুদিন অসবেই আর সেটা তাঁরই হাত ধরে। ভারতে এখন মোদী নামের গেরুয়া আবিরে আকাশ-বাতাস রঙিন। অগণিত জনতার বিজয়োল্লাস। সকলের মুখে বা অন্তরে 'হর হর মোদী' রব।

গান্ধী-নেহরুর ভারতকে তিনি বদলে দিয়েছেন। নির্বাচনের আগে তাঁর প্রধান রণনীতিই ছিল— উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া। সেজন্য কোনো বিভেদকে প্রশ্রয় দেননি। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'— এটাই ছিল স্লোগান। কোনো হিংসা বা 'মুজফ্‌ফরনগর' লাগেনি। মেকি সেকুলার সাজার চেষ্টা না করে মোট ৪০৩টি আসনের মধ্যে একটিতেও মুসলমান প্রার্থী না দিয়ে জোর দিয়েছেন একাত্মকরণে। অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে উন্নয়নের বার্তা দিয়ে এবং তিন তালাকের মতো জঘন্য প্রথার প্রশ্নে মুসলমান মহিলাদের ভোটও তিনি আদায় করেছেন। মোদীর এই জাদুকরি উত্থান স্তব্ধ করতে পারেনি বিরোধী শক্তিগুলি। মায়াবতী-মুলায়মেরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, বস্তাপচা বর্গীয় রাজনীতি থেকে তাঁরা এখনও বেরোতে পারেননি। কংগ্রেসও প্রমাণ করে দিয়েছে, একুশ শতকের সমাজ-ভাবনার সঙ্গে তাঁদের এখনও বিস্তর দূরত্ব! মোদীকে নিয়ে নানা ধরনের সমালোচনা থাকতেই পারে। কিন্তু নতুন প্রজন্মের মানসিকতা তিনি ঠিকই ধরতে পেরেছেন!

এক নতুন ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখছেন। স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। তাতে সফল তিনি। সেই ভারতে কিন্তু মেকি সেকুলারদের কোনো জায়গা নেই। আসুন, আপনিও সত্যিকারের সেকুলার হয়ে উঠুন। যে সেকুলার ভাবনা, যে উদারতা দেখাতে পারে শুধু হিন্দুত্ব। আর এস এস-কে সাম্প্রদায়িক তকমা না দিয়ে চিনুন, জানুন। ইতিহাস চর্চা করুন। নিজেকে সমৃদ্ধ করুন। ২০২২ সালে দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর। তার আগে বদলে যাবে ভারত। আসবে নতুন ভারত। এই ভারতকে আত্মস্থ করুন। নিজেকে তার যোগ্য করে তুলুন। বস্তাপচা ধারণা থেকে বেরিয়ে আসুন।

—**সুন্দর মৌলিক**

ক্লিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে এ জয় ভারতীয় গণতন্ত্রের জয়

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর, কলকাতার একটি নামী দৈনিক সংবাদপত্রের দিল্লিস্থিত সর্বজ্ঞ কলমচি লিখেছিলেন--- অখিলেশ এবং রাহুলের তারুণ্যের জোট এবার উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় আসছেই। সে নিয়ে কোনো সংশয় নেই, লড়াইটাও তা নিয়ে নয়। লড়াইটি হচ্ছে দ্বিতীয় স্থানটি কার দখলে থাকবে— নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর না বহেনজী মায়াবতীর? উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনটিকে মোদী এবং মায়াবতীর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হিসেবে সেদিন রায় দিয়েছিলেন ওই সর্বজ্ঞ সাংবাদিকটি। নির্বাচনী ফলাফল বেরনোর পর অবশ্য ওই সর্বজ্ঞ কলমচির বিশেষ উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি। তবে, এটা বোঝা গেছে, নির্বাচনের সময় তিনি যা যা লিখেছিলেন, তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্কই ছিল না। মানুষের হৃদ্‌স্পন্দন, মানুষের আবেগ, মানুষের চাওয়া-পাওয়া কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি ওই সর্বজ্ঞ কলমচি। বলা ভালো, বোঝার চেষ্টাও তিনি করেননি। যা তিনি লিখেছিলেন— সবটাই তাঁর ব্যক্তিগত মনগড়া কল্পনা। নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত অসূয়ার প্রকাশ। ওই কলমচিটি যে ব্যতিক্রম— তা বলা যাবে না। কেননা, প্রধানমন্ত্রী নোটবন্দির সাহসী সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করার পর এবং পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পর্বে--- দেশের সংবাদজগতের একটি বৃহৎ অংশ নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতায় সর্বস্ব পণ করে আসরে নেমেছিল। এমন একটি ধারণাই সৃষ্টি করে দিতে চেয়েছিল তারা যে, নোটবন্দির সিদ্ধান্তের ফলে দেশের সর্বস্তরের মানুষ ক্ষুব্ধ। তার প্রতিফলন ঘটবে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে। এবং এই নির্বাচনেই পর্যুদস্ত হয়ে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদীর কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। ভারতীয় রাজনীতির সবথেকে নাবালক এবং অপরিণতমনস্ক চরিত্র রাহুল গান্ধীকে ফানুসের মতো ফুলিয়ে তুলতেও এঁরা চেষ্টার কোনো কসুর করেনি। নির্বাচনের ফলাফল বেরনোর পর দেখা গেল— নোটবন্দির আগের মোদীর থেকেও, নোটবন্দির পরের মোদী অনেক বেশি শক্তিশালী। বোঝা গেল, দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ হওয়া তো দূরের কথা--- বরং সস্তা জনপ্রিয়তার তোয়াক্কা না করে সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জনতা জনার্দন প্রধানমন্ত্রীকে

দুহাত তুলে সমর্থন করেছে। আরও যা বোঝা গেল, তা হলো, এই সংবাদমাধ্যমগুলি যা লেখে, যা বলে--- তার আদৌ কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই।

আসলে ব্যক্তিগত কুৎসা, ব্যক্তিগত অসূয়া, ব্যক্তিস্বার্থের বিরুদ্ধে এবার প্রধানমন্ত্রীকে লড়াই করে জিতে আসতে হয়েছে। এই যে বৃহৎ অংশের এক সংবাদমাধ্যমের কথা বললাম— তাদের মোদী-বিরোধিতার মূলটাই ব্যক্তিগত অসূয়া। কেন এই অসূয়া। কারণ, নরেন্দ্র মোদী এঁদের অনেক শখ-আহ্লাদে বাদ সেধেছেন।। এর আগে যত প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন— তাঁরা প্রত্যেকেই বিদেশ সফর করেছেন সাংবাদিকদের বিশাল বাহিনী সঙ্গে নিয়ে। সরকারি পয়সায় বিদেশ সফর, এলাহি খানাপিনা, নানাবিধ উপঢৌকন— এলাহি ছিল সেসব ব্যবস্থা। শুধু প্রধানমন্ত্রী কেন; গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরাও বিদেশ যেতেন একঝাঁক পছন্দের সাংবাদিককে সঙ্গী করে। নরেন্দ্র মোদী এসে এই ব্যবস্থাটিকে ভেঙে দিয়েছেন। সরকারি পয়সায় যে আর প্রমোদ ভ্রমণ করা যাবে না— সে বার্তা স্পষ্ট দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আর যাবতীয় গোঁসা এতেই। প্রমোদভ্রমণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, মোদী সাংবাদিকদের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াচ্ছেন না, সাংবাদিকদের তুষ্ট করার কোনো ব্যবস্থা মোদীর সরকারের নেই— অতএব মোদী খারাপ, খুব খারাপ। মোদী স্বৈরতান্ত্রিক, মোদী জনবিরোধী, মোদী সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে মোদী হচ্ছে স্বাধীন ভারতের সত্তর বছরের ইতিহাসে প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি সস্তা চটুল জনপ্রিয়তাকে সঙ্গী করে নির্বাচনে লড়তে নামেননি। পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচনের ঠিক আগে আগেই নোটবন্দির মতো একটি সাহাসী সিদ্ধান্ত নরেন্দ্র মোদী নিয়েছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত শুধু যে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরকে হতবাক করেছিল তা-ই নয়, শোনা যায়, তাঁর দলের একটি অংশও সন্দিগ্ধ হয়েছিল। সকলেই এমনটি ভেবে নিয়েছিল মোদীর এই সিদ্ধান্ত পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপির বিপর্যয়কেই ডেকে আনতে চলেছে। অবশ্য এঁদের কাছে এরকম ভাবাটাই স্বাভাবিক। কারণ এরা এর আগে ব্যতিক্রমী রাজনীতি এবং ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেননি। ভোটে জিততে এরা বরাবরই চটুল পপুলিস্ট রাজনীতিকেই ব্রহ্মাস্ত্র করে এসেছেন বরাবর। এই চটুল রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে যে সাহসী হওয়া যায়— সে বোধটিই এঁদের কখনও হয়নি।

যেমন, এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তোষণের রাজনীতিতে তাঁর দক্ষতা সীমাহীন। তিনি মনে করেন নগ্ন মুসলমান তোষণ করে এবং ইমাম, মোল্লা, মৌলবিদের ব্ল্যাকমেলিংয়ের কাছে মাথা নত করেই ক্ষমতার চাবিকাঠি চিরকাল নিজের আঁচলে বেঁধে রাখা সম্ভব। কাজেই নোটবন্দির কেন্দ্রীয় সরকারি সিদ্ধান্তের পর পাড়ায় পাড়ায় হোর্ডিং লটকে দিলেন মমতা— মোদী হঠাও দেশ বাঁচাও। দিল্লি, ওড়িশা, পাটনায়, লখনউয়ে ছুটে গিয়ে সভা করলেন। এখন অবশ্য কেউ তাঁকে বলছে না— লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে মোদী হটাও, দেশ বাঁচাও হোর্ডিংটি তাঁর খুলে ফেলা উচিত। ভারতীয় রাজনীতির অপরিণতমনস্ক চরিত্র রাহুল গান্ধী খাটিয়া সভা করলেন। সভা থেকে খাটিয়া চুরি হয়েও গেল। গ্রামে গ্রামে ঘুরে এসে রাহুল ঘোষণা করলেন— নোটবন্দির পরে দেশের

মানুষ বড় দুঃখে আছেন। এবার তাঁরা মোদীকে বিদায় করবেনই। বহেনজী মায়াবতী ঘোষণা করলেন— মোদীর সরকার দলিত বিরোধী। অতএব দলিতের সমর্থন মোদী পাবেন না। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল বামপন্থীরা বললেন, মোদীর মতো 'উগ্র ফ্যাসিবাদী' শক্তির উত্থান ঠেকাতে হলে সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিকে এক হতে হবে। তবে কুরুচিকর ভাষণে শেষ পর্যন্ত সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টির নব প্রজন্মের নেতা অখিলেশ যাদব। নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গুজরাটের বন্য গাধার তুলনা করে অখিলেশ নিম্নরুচির রাজনীতির প্রমাণ রাখলেন। ভোটের ফল বেরনোর পর দেখা গেল দলিত ভোট মায়াবতীকে ত্যাগ করেছে। দলিত এবং মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপিরই জয়জয়কার। দেখা গেল, গুজরাটের 'চা-ওয়ালা' নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কাছে গোহারা হেরে বসে রয়েছেন পাশ্চাত্যের আদব কায়দায় রপ্ত রাহুল-অখিলেশ।

আসলে, পাঁচটি রাজ্যের ভিতর চারটিতে সরকার গঠন করা বা অনেক আসন জেতাই নয়, নরেন্দ্র মোদীর কাছে এবার এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন ছিল অনেক ব্যাপক এবং অনেক অর্থবহ। চিরাচরিত পপুলিস্ট রাজনীতির বাইরে বেরিয়ে তিনি যে ভারতীয় রাজনীতিকে একটি উত্তরণের দিশা দেখাতে চাইছেন— তাঁর সেই চাওয়াকে ভারতবাসী কতটা মর্যাদা দিতে পারছে— সেটাই এবার বড় পরীক্ষা ছিল নরেন্দ্র মোদীর কাছে। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে নোটবন্দির মতো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নরেন্দ্র মোদী যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। দেশের মানুষ যদি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত না জানাতো— তাহলে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব সত্যিই প্রশ্নের মুখে পড়ত। কিন্তু অন্য অনেকে সন্দিগ্ধ হলেও, নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং বুঝেছিলেন--- সাধারণ মানুষ তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাবেই। নরেন্দ্র মোদীর ভাবনাতে যে ভুল কিছু ছিল না, তার প্রমাণ পাঁচরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ওড়িশা এবং মহারাষ্ট্রের পঞ্চায়েত এবং পুরসভাগুলির নির্বাচন। ওই নির্বাচনগুলিতে বিজেপির সাফল্য তখনই প্রমাণ করে দিয়েছিল--- নোটবন্দির পরের মোদী নোটবন্দির আগের মোদীর থেকেও অনেক বেশি শক্তিশালী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন। মোদী বিরোধীরা ওড়িশা এবং মহারাষ্ট্রের ওই নির্বাচনগুলির নিহিতার্থটাই ধরতে পারেননি। ধরতে পারলে, মোদী হটাও দেশ বাঁচাও-এর মতো হাস্যকর স্লোগানটি দিতে যেতেন না। এবার নির্বাচনী ফলাফলে বোঝা গিয়েছে, বহেনজীর সাধের দলিত ভোট বহেনজীকে ত্যাগ করে গিয়েছে। এবং তার একটি গরিষ্ঠ অংশ এসেছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপির দিকে। ভারতীয় রাজনীতিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ইঙ্গিত করছে। জাতপাতের রাজনীতির দিনটিও যে ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে— এই ইঙ্গিত সেই দিকেরই। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশে'র স্লোগানে যে মোদীর প্রতি আস্থাবান হয়েছে গাঁ-গঞ্জের মানুষ— এবারের নির্বাচন তার প্রমাণ। তাঁর নেতৃত্বে বিজেপি কটা আসন জিততে পারে, তার থেকেও মোদীর কাছে বড় লড়াই ছিল জাতপাত, তোষণ, সস্তা চটুল রাজনীতিতে সমৃদ্ধ ভারতীয় রাজনীতির একটি উত্তরণ ঘটানো। এবং বলতেই হবে, পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী ভারতীয় রাজনীতির সেই উত্তরণ অনেকটা হলেও ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন।

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন সমাপ্ত। বলা হয়ে থাকে, উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি দেশের রাজনৈতিক গতিপথের একটি ইঙ্গিত দেয়। যদি তাই হয়, তাহলে বলতে হবে— ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ২০১৪-র নরেন্দ্র মোদীকেও ছাপিয়ে যাবেন এবারের নরেন্দ্র মোদী। এমনিতেই সাদা চোখে এখন বোঝা যাচ্ছে, ২০১৯-এ লোকসভা দখলের পথে নরেন্দ্র মোদী অনেকেটাই এগিয়ে। এও বেশ বোঝা যাচ্ছে, একক ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিতে নরেন্দ্র মোদীকে মোকাবিলা করার মতো কোনো নেতাও এখন ভারতীয় রাজনীতিতে নেই। এই অবস্থানে বিপর্যস্ত মোদী বিরোধীরা কী করতে পারেন? প্রথমত, ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস এখন অপাংক্তেয়। বিভিন্ন রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাকে। হয়তো অচিরেই কংগ্রেস মুক্ত ভারতও আত্মপ্রকাশ করবে। আর লালু, মুলায়ম, মমতা, অখিলেশ, করুণানিধিরা কী করবেন এখন? অপ্রতিরোধ্য নরেন্দ্র মোদীকে প্রতিহত করার মতো কোনো অস্ত্র তো তাঁদের হাতে নেই এখন। এই আঞ্চলিক নেতানেত্রীদের এখন বুঝতে হবে— চিরকাল যে দানখয়রাতি এবং তোষণের পপুলিস্ট রাজনীতিটি তাঁরা করে এসেছেন— সেই রাজনীতির দিন এবার শেষ। তাঁদের বুঝতে হবে, বেশ কিছু মানুষকে কিছুদিন ভুল বুঝিয়ে রাখা যায়; চিরকাল ভুল বুঝিয়ে রাখা যায় না। যে মানুষগুলিকে তাঁরা এতদিন ভুল বুঝিয়ে ভোট আদায় করেছেন— তাঁরা এবার নরেন্দ্র মোদীর মতো এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে দেখতে পারছেন। তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, এমন এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বর হাতে ভারতের শাসনভার অর্পিত হয়েছে, যিনি নিম্নশ্রেণীর চটুল রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে অন্যকিছু ভাবছেন। অতীতে এরকম আর কেউ ভাবেননি। আম আদমিকে এই নরেন্দ্র মোদীই মুগ্ধ করেছেন। মমতা-মায়াবতী, মুলায়ম, লালুপ্রসাদ, অখিলেশদেরও বুঝতে হবে--- মোদীর মোকাবিলা করতে হলে তাঁদেরও জাত-পাত তোষণের পুপুলিস্ট রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে অন্যকিছু ভাবতে হবে। বুঝতে হবে তাঁদের সস্তা রাজনীতির দিন এবার শেষ।

শেষ কথা, পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে তাহলে জিতল কে? সাদা চোখে দেখা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশে এবং উত্তরাখণ্ডে ঐতিহাসিক জয় বিজেপির। মণিপুরে শূন্য থেকে একেবারে সরকারে। গোয়াতেও সরকার বিজেপির। একমাত্র পঞ্জাব হাতছাড়া। জোটশরিক অকালি দলের ওপর ক্ষোভের কারণে এবার পঞ্জাবের মানুষ যে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করতে পারেন— তা বিজেপি নেতৃত্ব আগেই বুঝেছিলেন। সে ইঙ্গিত বিজেপি সভাপতি অমিত শাহও দিয়েছিলেন। তবু আমি বলব এ বিজয় শুধু বিজেপির বিজয় নয়। এ বিজয় নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীরও ব্যক্তিগত বিজয় নয়। এ জয় প্রকৃত অর্থেই গণতন্ত্রের জয়। জাতপাত তোষণের রাজনীতির যে ক্লিন্নতায় এতদিন ধরে নিমজ্জিত ছিল ভারতীয় রাজনীতি— তার থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত গণতান্ত্রিক পথে ফিরে আসার বিজয়। গণতন্ত্রের এই জয়টাই নরেন্দ্র মোদী চেয়েছিলেন। সেই জয়ই সম্ভব হয়েছে।

ভরসাযোগ্য নেতৃত্বের জয়

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী

ভোটে সব দলই মানুষের ভালো করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কে কত বেশি প্রতিশ্রুতি দিল তার ভিত্তিতে ভোটাররা সিদ্ধান্ত নেন না; বরং কে বেশি বিশ্বাসযোগ্য তার উপরই ভোটারদের মতিগতি নির্ভর করে। এই নিরিখে উত্তরপ্রদেশের ভোটে নিঃসন্দেহে নরেন্দ্র মোদীই সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন। দেশজোড়া তাঁর নেতৃত্বের সুনাম এবং তাঁর প্রতি অবিচল আস্থা এই বিপুল জয় এনে দিয়েছে।

শুধু কংগ্রেস বিরোধীরাই নয়, আজ কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরাও এই প্রশ্নটা তুলতে শুরু করেছে যে পরিবারকেন্দ্রিক অন্তঃসারশূন্য এই কংগ্রেস দলটা কি আদৌ বেঁচে থাকবে?

উত্তরপ্রদেশে রাহুল গান্ধী দলের মুখ ছিলেন। সেখানে বিশেষ করে আমেথির মতো কেন্দ্র যা এতদিন গান্ধী পরিবারের উঠোন বলে পরিচিত ছিল, সেখানেও কংগ্রেস যেভাবে গোহারা হেরেছে তা থেকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ পরিবারটির জনপ্রিয়তা এখন কত নীচে নেমে গেছে! কিছুদিন আগে পর্যন্তও জাতপাত নির্ভর উত্তরপ্রদেশের সমীকরণটা ছিল যে, উচ্চবর্ণের ভোট এমনিতেই ভাগ হবে, জিততে গেলে নিম্নবর্গ আর মুসলমান তোষণ করতে হবে। কিন্তু সাম্প্রতিককালের বা অতি সাম্প্রতিক এই নির্বাচনে এই তত্ত্বটা একেবারে অচল হয়ে গেছে। ২৫ শতাংশেরও বেশি মুসলমান-অধ্যুষিত কেন্দ্র থেকে বিজেপি ৫৭টি আসন জিতেছে যেখানে, কংগ্রেস-সপা মাত্র ২৮টি এবং বসপা মোটে তিনটে আসন পেয়েছে।

দারিদ্র্য যে জাতপাত বা ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এই সারসত্যটা এতদিন ধান্দাবাজ ক্ষমতার কারবারিরা বেমালুম চেপে গিয়েছিলেন। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের মনগড়া বিভাজনের অন্ধগলিতে পথ হারিয়েছিল। পঞ্চাশের দশকে তৈরি করা সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক তত্ত্বকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বিভাজনের মোড়কে 'নিরাপত্তাহীনতা' নাম দিয়ে উচ্চফলনশীল বীজ হিসেবে ছোট ছোট প্যাকেট করে ভোট-কারবারিরা এতদিন পাইকারি দরে রাজনৈতিক দলগুলিকে বিক্রি করতো। লালু-মুলায়মদের মতো নেতারা ভোটকে রীতিমতো অংকের মারপ্যাঁচ বানিয়ে ক্ষমতা দখল করে গেছে। তাদের সাফল্যের কাছে সুশাসন বিষয়টা অপ্রাসঙ্গিক আর হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীর গরিবির স্লোগান বেশ অনেকটা সময় জুড়ে কংগ্রেসকে অক্সিজেন জুগিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় গরিবরা বুঝতে পারছিলেন যে এটা নির্বাচনী ভাঁওতা ছাড়া কিছু না। কংগ্রেস মানে পরিবারতন্ত্র, দুর্নীতি আর স্বজনপোষণ, এটা বুঝতে মানুষের আজ আর ভুল হয় না। অন্যদিকে ভূমিপুত্র সমাজবাদীরা সবসময় জাতপাতকে সামনে টেনে এনেছে। শেষপর্যন্ত গরিবরা নরেন্দ্র মোদীর মতো একজন নেতাকে পেয়েছেন যিনি তাঁদের প্রত্যাশামতোই কাজ করেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সংসদে তাঁর প্রথম ভাষণেই মোদীজী বিজেপি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল গরিবি হঠানোর জামানা শেষ হয়েছে, এবার দারিদ্র্য নির্মূল করার জামানা শুরু হয়েছে। লালকেল্লা থেকেও তাঁর প্রথম বার্তায় এই মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন যে, প্রতিদিন গরিবের জীবনযাত্রার মান না বাড়াতে পারলে সেই সরকারের কোনো প্রয়োজন নেই। সেদিন দিল্লীর তাবড় কেষ্টবিষ্টু-সহ বিরোধীরা তাঁর কথায় নাক সিঁটকেছিল।

উত্তরপ্রদেশের ঐতিহাসিক জয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে হলে বাস্তবটা একবার দেখে নিতে হবে। প্রথাগত গরিবির পরিসংখ্যানের বাইরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুদ্রা যোজনা যুবসম্প্রদায়ের ভেতর আত্মনির্ভরতা ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে। এই যোজনায় শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশেই ২০১৫ সালে ৩৩,৪৫,৩৬২ টি ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে যার অর্থমূল্য ১২,২৭৫ কোটি টাকা। ২০১৬-তে আনুষঙ্গিক জামিন ছাড়াই এখানে ১০,৭৫৫ কোটি টাকার ২৮,৬০,২৪৩টি ঋণ দেওয়া হয়েছে। এই টাকাটা মোটেই পকেট গলে বেরিয়ে যায়নি বরং, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। গরিবরা আর একটা প্রকল্প, জনধন যোজনার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছেন। রাজ্যে চার কোটিরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছে যার মধ্যে আড়াই কোটি রয়েছে গ্রামীণ এলাকায়। প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা

যোজনায় ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ বার্ষিক ১২ টাকা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমা করিয়েছেন। ৫২ হাজারেরও বেশি পরিবার যারা কোনোদিন রান্নার গ্যাস ব্যবহারের কথা ভাবতে পারতো না, তারাও আমানতহীন গ্যাস সংযোগ পেয়েছেন। গরিব মহিলাদের কথা ভেবে লক্ষাধিক শৌচাগার তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। মোদীজীর অজস্র জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে এগুলি হাতেগোনা কয়েকটা মাত্র! লোকের মনে ধীরে ধীরে সচেতনতা ও বিশ্বাস জেগেছে যে মোদীজী কাজের মানুষ।

ব্যাঙ্কিং পরিষেবা যে উন্নয়নের একটা মাধ্যম সেটা আর আজকের দিনে নতুন কথা নয়। কিন্তু প্রশ্নটা ছিল যে কাদের উন্নয়ন? শুধুমাত্র অর্থনীতি-নিয়ন্তা না হয়ে ব্যাঙ্কগুলি আজ সত্যি সত্যিই জনগণের সেবক হয়ে উঠেছে। ইন্দিরা গান্ধী শুধু নামেই ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করেছিলেন। তাদের জন্য সেগুলির দরজা খোলাতে গরিবদের নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। জনধন অ্যাকাউন্ট খোলার সময় তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা টিভি চ্যানেলে বসে অনেক ঠাট্টা-তামাশা করেছেন। এই সব অ্যাকাউন্টে টাকা নেই বলে বিরোধীরা হাসাহাসি করেছেন। তাঁরা এটা লক্ষ্য করতে ভুলে গেছিলেন যে একেবারে কপর্দকহীন মানুষগুলো প্রথমবার তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পেলেন। এখন সরকারি সুবিধা আর নেতা-হোতাদের হাত ঘুরে গরিবদের কাছে পৌঁছয় না, সরাসরি অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। তবুও এত বড় একটা পরিবর্তনকে প্রভাবশালী রাজনীতি ও গণমাধ্যম গোষ্ঠী মেনে নিতে নারাজ। এইসব সুখী, যেমন চলছিল তেমনটাই চলুক মনোভাবের মানুষগুলো আসলে পরিবর্তনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। তাঁরা চোখে ঠুলি পরে থাকেন আর ভাবেন যে এই পরিবর্তনগুলি বুঝি সাধারণ মানুষের নজর এড়িয়ে যাবে। নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে যখন আমজনতা সাধুবাদ জানাচ্ছিলেন সে সময় তাঁরা এর অপব্যাখ্যা করেছেন। নোট বাতিলের পরপরই চণ্ডীগড়ের পৌরনির্বাচন, উত্তরপ্রদেশের আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েছিল। ঝুপড়ি-বস্তির ভোটগুলো কিন্তু কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপির পালে জড়ো হয়েছে। এতবড় রাজ্যে ভোটপর্ব সামলাতে নরেন্দ্র মোদীর অমিত শাহের মতো একজন দক্ষ সংগঠকের প্রয়োজন ছিল। নিখুঁত ভাবে দায়িত্ব সামলে অমিত শাহ পার্টির সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক তরজা-পাল্টা তরজার মাঝে যাতে বিজেপির উন্নয়নের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছয় তা সুনিশ্চিত করেছেন। বিরোধীরা বিজেপির চাল বুঝেই উঠতে পারেননি। তাঁরা মানতেই পারছেন না যে মুসলমানরাও বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। একটিও মুসলমান প্রার্থী না দাঁড় করিয়ে বিজেপি মুসলমান বহুল আসনের ১০৪টি দখল করেছে। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও জাতীয় নেত্রী, মায়াবতী দাবি করেছেন যে এসব নাকি ভোটিং মেশিনের কারচুপিতে হয়েছে! মুসলমানরা বিশেষ করে মুসলমান মহিলারা প্রাধানমন্ত্রীর কাজ- কারবারকে সমর্থন করেছেন যার ঢেউ আছড়ে পড়েছে সুদূর পশ্চিমবঙ্গে। পিরজাদা ত্বহা সিদ্দিকির প্রতিক্রিয়াতে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাঁরা দেখেছেন যে সৌদি আরবে নরেন্দ্র মোদীকে কী বিরাট অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং আমিরশাহির রাজপুত্র এবারকার গণতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি ছিলেন। মুসলমান দেশগুলির সঙ্গেও মোদীজীর সখ্য দিন-দিন বাড়ছে। তাঁর ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’— শুধু ফাঁকা আওয়াজ নয়; দেশেই হোক বা বিদেশে, তিনি জাতি-ধর্ম ভেদাভেদ না করে সবার উন্নয়নকে মন্ত্র করে নিয়েছেন।

তাই এবারকার ভোট ধর্মের ভিত্তিতে হয়নি। দেশকে সামনে রেখে আর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দারিদ্র্যকে নির্মূল করার ‘সংকল্প’ নিয়েই এবারকার ভোট হয়েছে। একেই বলে সুশাসন। মোদীজী দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবার লোক নন। একজন গতানুগতিক প্রধানমন্ত্রী হবার বদলে তিনি একজন প্রকৃত জননায়ক হয়ে উঠেছেন। ■

যোগী আদিত্যনাথের শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উত্তরপ্রদেশের ২১তম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন যোগী আদিত্যনাথ যিনি গোরখপুরের পাঁচবারের সাংসদ তথা গোরক্ষনাথ মঠের প্রধান। সঙ্গে জোড়া-উপমুখ্যমন্ত্রী — কেশবপ্রসাদ মৌর্য ও দীনেশ শর্মা। লখনউ-এর কাঁসিরাম স্মৃতি উপবনে লাখখানেক মানুষের উপস্থিতিতে ৪৭ সদস্যের মন্ত্রিসভার এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী থেকে শুরু করে কেন্দ্র ও রাজ্যের অনেক হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীই উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’-এর লক্ষ্যে তিনি উত্তরপ্রদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। প্রত্যাশা মতোই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ছিল সাধুসন্তদের বিপুল সমাগম। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রবীণ তোগাড়িয়া বলেন, অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের দীর্ঘদিনের দাবি এবার পূরণ হবে বলে আশা রাখি।

হাসিনার ভারত-বিরোধী অভিযোগ বিদ্বেষের রাজনীতির ফল

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে যাওয়ার আগে হঠাৎ করেই তোপ দাগলেন সেদেশের বিরুদ্ধে। তিনি চারদিনের ভারত সফরে যাচ্ছেন এপ্রিল মাসের ৭ তারিখে, থাকবেন রাষ্ট্রপতি ভবনে। এই প্রথম বাংলাদেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ভবনে অবস্থান করবেন। দুবার পিছিয়ে তৃতীয়বারের মতো সফরসূচি নির্ধারিত হয়েছে। বহু আলোচিত এই সফরের আগে শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছেন, ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামি লিগকে হারাতে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ও যুক্তরাষ্ট্র একজোট হয়েছিল। তখন 'র'-এর প্রতিনিধি ও মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তা বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কার্যালয় 'হাওয়া ভবনে' বসে থাকতেন। ভারতের কাছে গ্যাস বিক্রির মুচলেকা দিয়ে ওই নির্বাচনে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসেন। উল্লেখ্য, 'হাওয়া ভবন' নিয়ন্ত্রণ করতেন খালেদা-পুত্র তারেক রহমান।

প্রধানমন্ত্রীর আকস্মিক এ মন্তব্যে হতচকিত হয়ে গেছে ঢাকার রাজনৈতিক মহল। কয়েকদিন ধরে প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন ভারত সফর নিয়ে সমালোচনা ও মনগড়া অভিযোগের ঝড় বইয়ে দিয়েছে বিএনপি। দিল্লি থেকে সংবাদদাতারা বলেছেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও বৃদ্ধি পেতে চলেছে। সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে ভারত ৫০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব করেছে। অনুচুক্তি বা সমঝোতা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে যৌথ সহযোগিতায় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি হবে। এছাড়া সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ আরও নিবিড় করা হবে। বাড়ানো হবে সামরিক প্রশিক্ষণ। দুদেশের মধ্যে কয়েক বছর ধরেই যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর

শেখ হাসিনা

খালেদা জিয়া

ভারত-বিদ্বেষ বাংলাদেশের রাজনীতির একটা বড় 'ফ্যাক্টর'। যারা ভারত-বিদ্বেষকে রাজনীতিতে ব্যবহার করে ফায়দা লুটতে চায় তাদের এখন পোয়াবারো।

পরিধি আরও বাড়বে। বাংলাদেশের জন্য সামরিক নৌযান নির্মাণেও ভারত সাহায্য করবে। এসব খবর বিএনপিকে উত্তেজিত করে তুলেছে ভয়ানকভাবে। প্রধানমন্ত্রীর সফরের এখনও দীর্ঘ সময় বাকি, প্রতিরক্ষা চুক্তি বা সমঝোতা কোনোটাই চূড়ান্ত হয়নি। আলোচনা চলছে। এর মধ্যেই বিএনপি নেতারা ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে 'ষড়যন্ত্রের' আঁচ পেয়ে গেছেন। দাবি করেছেন চুক্তিতে কী কী আছে প্রকাশ করতে হবে।

অথচ চীনের সঙ্গে অতি সম্প্রতি দুটি সাবমেরিন কেনা নিয়ে বিএনপি কিছুই বলেনি। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ঢাকা সফরে এসে বাংলাদেশকে ২৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়ে গেছেন। বাংলাদেশ চীনের সামরিক সহযোগিতা চার দশকের, বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীতে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের বিশাল অংশ চীনের। 'ডিপ্লোম্যাট' সাময়িকীর গত ২১ ডিসেম্বর সংখ্যায় বলা হয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশে যে সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে তার ৭৮ শতাংশ জোগান দেয় চীন। চীনের প্রেসিডেন্টের ঢাকা সফরে এই প্রভাব আরও বেড়েছে। চীন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। চীনা অস্ত্র দিয়েই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নিধনে মেতেছিল। অথচ ৩০ লাখ বাঙালি হত্যায় চীনের ভূমিকা গোপন কিছু ছিল না, অস্বীকার করার উপায় নেই। স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত থাকা পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি চীন। জাতিসঙ্ঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর ৪৮ ঘণ্টা না পেরোতেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে, জাতিসঙ্ঘে সদস্যপদও আটকায়নি। বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা তৎকালীন সেনাপ্রধান

ও সেনাশাসক জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্যে চীনের দরজা খুলে দেন। আওয়ামি লিগ আমলেও চীনের দরজা বন্ধ হয়নি। আওয়ামি লিগ নেতারা কখনো একাত্তরে এবং পরবর্তী সময়ে চীনের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেননি। শেখ হাসিনা যেভাবে ভারতকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন, চীনকে কখনো সেভাবে অভিযুক্ত করেননি। রাজনীতি সত্যিই বড় বিচিত্র। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর শেখ হাসিনাকে কোনো দেশ আশ্রয় দিতে চায়নি, স্বামীপুত্রসহ আশ্রয় দেয় ভারত সরকার। পরমাণুবিজ্ঞানী স্বামীকে সরকারি চাকরিও দেওয়া হয়।

চীন থেকে কেনা সাবমেরিন দুটি সম্প্রতি নৌবাহিনীতে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সে অনুষ্ঠানে বলেছেন, বাংলাদেশ আক্রান্ত হলে সমুচিত জবাব দেবে। কিন্তু আক্রমণটা করবে কে? তিনদিকে ভারতবেষ্টিত বাংলাদেশ, সামান্য সীমান্ত মিয়ানমারের সঙ্গে। ভারত বাংলাদেশের জন্য যন্ত্রণা ভাগ করে নিয়েছে, রণাঙ্গণে দুদেশের রক্ত এক স্রোতে মিলেছে। এক কোটিরও বেশি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে, ধ্বংসস্তূপ থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে সহায়তা করেছে। গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার সংগ্রামে পাশে দাঁড়িয়েছে। সেখানে কোনো কারণে ভুলের দেয়াল মাথা তুলুক, ছেদ পড়ুক সম্পর্কে তা নিশ্চয়ই দুদেশের সিংহভাগ মানুষ চাইবেন না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, চীন থেকে বাংলাদেশের সাবমেরিন কেনার বিষয়টি সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি ভারত। সাবেক সামরিক কর্মকর্তা ও বিশ্লেষকদের কথাবার্তায় তা স্পষ্ট। ভারতের নৌবাহিনীর সাবেক প্রধান অরুণ প্রকাশ বলেছেন, বাংলাদেশ যে অর্থনৈতিক অবস্থায় আছে তাতে সাবমেরিন কেনা কেবল অযৌক্তিক নয়, উস্কানিমূলকও। (ডিফেন্স নিউজ, ২৩ নভেম্বর ২০১৬)। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শরণ সিং বলেছেন, বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে চীনা অস্ত্রশস্ত্র কিনে আসছে। কিন্তু সাবমেরিন সংগ্রহ এ অঞ্চলে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। ভারতের উদ্বেগ হলো, চীন সাবমেরিন রপ্তানির মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে আধিপত্য বিস্তার করতে চাইবে। বাংলাদেশ নিশ্চয়ই তা জানে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নগুলো উঠেছে। ভারতের উদ্বেগ বোঝা যায়, যখন চীনা প্রেসিডেন্টের সফরের অব্যবহিত পরই ৩০ নভেম্বর ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পরর্রিকর ঢাকা ছুটে আসেন। এটা ছিল ভারতের কোনো প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রথম বাংলাদেশ সফর। তখন ভারতীয় হাইকমিশনের এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, প্রতিরক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়াতে বেশ কিছু নতুন উদ্যোগের প্রস্তাব দিয়েছেন। সব ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে অব্যাহত সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর চীনাকরণ একদিনে হয়নি। পঁচাত্তরের পর দিনে দিনে এক শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছে চীন, একক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। ৭৮ ভাগ সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র মানে সাম্রাজ্যই তো বটে। এই বিষয়টি টের পেতে ভারতের চার যুগ লাগলো? শেখ হাসিনা বিএনপিকে দাবড়াতে ভারতকে টেনে এনেছেন। এখন বিএনপি এর জবাব দিতে বলছে, ২০১৪ সালের নির্বাচনে ভারতই আওয়ামি লিগকে ক্ষমতায় এনেছে। এক্ষেত্রে 'র' বিরাট ভূমিকা পালন করে। ভারত-বিদ্বেষ বাংলাদেশের রাজনীতির একটা বড় 'ফ্যাক্টর'। যারা ভারত-বিদ্বেষকে রাজনীতিতে ব্যবহার করে ফায়দা লুটতে চায় তাদের এখন পোয়াবারো। সুদূরপ্রসারী এ খেলা খেলছে কারা? মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিবিরের তো জানার কথা। ■

র‍্যাবের নির্মীয়মাণ সদর দপ্তরে আত্মঘাতী হামলা, জখম দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ঢাকার আশকোনায় বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‍্যাবের নির্মীয়মাণ সদর দপ্তরে একটি আত্মঘাতী হামলায় বোমা বহনকারী এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন র‍্যাবের দুই সদস্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশে আত্মঘাতী হামলা এই প্রথম। এই হামলার দায় এখনও পর্যন্ত কোনো জঙ্গিগোষ্ঠী স্বীকার না করলেও, র‍্যাবের গণমাধ্যম শাখার পরিচালক মুফতি মাহমুদ খান বলেন, 'বিস্ফোরকের ধরন দেখে মনে করা হচ্ছে এটা কোনো জঙ্গিগোষ্ঠীরই কাজ।' বাংলাদেশের সব কারাগারে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহাপরিদর্শক (আই জি প্রিজন) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ ইফতেখারুদ্দিন।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

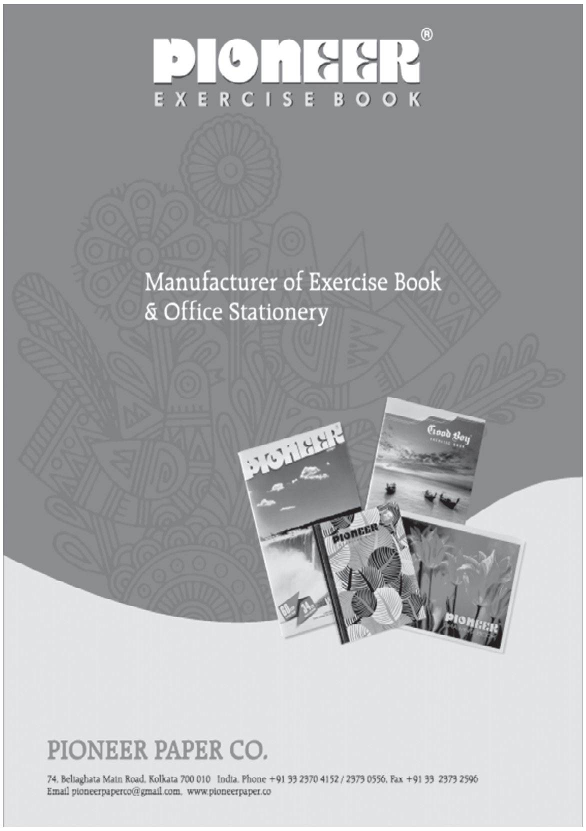

“ভারতের প্রতিটি ভয়ার্ত ক্রন্দন, দুর্বলতাপ্রসূত উত্তেজনা, অপমানজাত সঙ্কোচবোধ তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) অনুভব করতেন। ভারতের অন্যায় আচরণের তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক, তার সাংসারিক অনভিজ্ঞতার উপর খড়্গহস্ত, কিন্তু সে কেবল ঐ দোষগুলিকে তিনি নিজেরই মনে করতেন বলে। পক্ষান্তরে তাঁর মতো আর কেউ ভারতের ভাবী মহিমার কল্পনায় এত অভিভূত হতেন না।”

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল ও জাতীয় অর্থনীতিতে তার প্রভাব

অম্লানকুসুম ঘোষ

রঙের উৎসব দোলের আগের দিন এবারে ঘোষিত হলো পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন রঙের ছাপ এঁকে দিয়েছে এবারের দোল। রাজনৈতিক দলের জয়-পরাজয় এবং তার দরুন রং-'বেরং' হওয়া তো স্বাভাবিক, কিন্তু নির্বাচনী এই ফলাফল সামগ্রিকভাবে দেশের ভবিষ্যতকে কোন রঙে রাঙাবে? দেশের জনগণের জন্য কোন রঙের ভবিষ্যৎ বরাদ্দ করল এবারের নির্বাচনী ফলাফল তা জানার ইচ্ছে সকলেরই। পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণে দেখা যাক্, পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে জয় পরাজয় নির্ধারিত হলো কোন মাপকাঠিতে এবং এই ফলাফল ভারতীয় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে ঠিক কোন আঙ্গিকে?

প্রথমেই আসা যাক্ উত্তরপ্রদেশের কথায়। জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের বৃহত্তম রাজ্যটি বরাবরই জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এসেছে। ৮০টি লোকসভা আসনের অধিকারী এই রাজ্যটির নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে আগ্রহ ছিল তাই সকলেরই। গত দেড় দশক ধরে সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি ও ত্রিশঙ্কু সরকার শাসিত রাজ্যটিতে এবার রেকর্ড সংখ্যক আসনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। মোট ৪০৩টি আসনের মধ্যে ৩২৪টি আসনই গেছে তাদের দখলে। এই বিপুল বিজয়ের কারণ কী, বিশ্লেষণে দেখা যাক্। অর্থনীতিগত দিক দিয়ে বিমুদ্রীকরণ একটি বড় কারণ, বিমুদ্রীকরণের ফলে জনসাধারণের কী উপকার হয়েছে এবং তার ফলস্বরূপ ভোটবাক্সে কীভাবে বিজেপির

রাজনীতি ও অর্থনীতি যখন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে, রাজনৈতিক জয় যখন ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পথ প্রস্তুত করে তখনই দেশের ভাগ্যাকাশে নব ঊষার সূচনা হয়েছে বলা যায়। সেই ঊষালগ্নে আজ সমাগত হয়েছে আপামর ভারতবাসী— আর্থ- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নব সূর্যোদয় দেখার অপেক্ষায়।

ওপর জনগণের আশীর্বাদ অকৃপণ ধারা বর্ষিত হবে সেকথা ইতিপূর্বেই ব্যক্ত। এছাড়াও বিমুদ্রীকরণের আরেকটি পরোক্ষ প্রভাবও এই নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির অনুকূলে গেছে, তা হলো প্রত্যেকবার নির্বাচনের সময় উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টি কালোটাকা ছড়িয়ে নির্বাচনী ফলকে প্রভাবিত করে। কিন্তু বিমুদ্রীকরণের ফলে এবার সপা ও বসপা'র সেই কালোটাকার ভাণ্ডার জলে গেছে। তাই উত্তরপ্রদেশের ভোটারদের রায় কালোটাকার রাহুমুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ সূর্যালোকের মতোই সকলের আনন্দবর্ধন করেছে। জয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিন তালাকের মতো একটি ঘৃণ্য অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী শক্তির দীর্ঘদিনব্যাপী অনমনীয় দৃঢ় সংগ্রাম মধ্যযুগীয় আবহাওয়ায় বাস করা অত্যাচারিত মুসলমান মহিলাদের মুক্তির আলো দেখিয়েছে। সংখ্যালঘুর দুঃখে কাতর তথাকথিত সেকুলার দলগুলি, পাশ্চাত্য ভাবনায় তাড়িত নারীবাদীরা এবং পেট্রোডলারের আশীর্বাদধন্য তথাকথিত নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যম যখন তিন তালাক বজায় রাখার পক্ষে হাজারো যুক্তি খুঁজতে ব্যস্ত এবং তিন তালাকের হাত থেকে মুসলমান মহিলাদের মুক্তিদানের একমাত্র উপায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিতে তৎপর, তখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলারা তাদের সামনে আশার সূর্য হিসেবে একমাত্র জাতীয়তাবাদী শক্তিকেই ত্রাতার ভূমিকায় পেয়েছে। ভোটবাক্সে তার প্রতিফলনও হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ঘোষণা করে তাদের প্রতি জ্ঞাপিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলাদের আস্থার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানাবেন। এছাড়াও জাতের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে না থেকে একত্রিতভাবে সমগ্র ভারতের উন্নতি করার চিরন্তন সঙ্ঘশিক্ষাও এবার উত্তরপ্রদেশের

ভোটারদের জাতপাতের মোহমুক্ত হয়ে দেশহিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে প্রণোদিত করেছে।

উত্তরপ্রদেশের পার্শ্ববর্তী প্রদেশ উত্তরাখণ্ডেও একই চিত্র বর্তমান। বিমুদ্রীকরণ সেখানকার জনগণকেও উপকৃত করেছে। এছাড়া সেখানে বর্তমান কংগ্রেস সরকারের কুশাসন তাদের প্রণোদিত করেছে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারে অধিষ্ঠিত দলকেই রাজ্যে ক্ষমতাসীন করতে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ রাজ্য মণিপুর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ। উত্তর-পূর্বের অন্যান্য রাজ্যের মতোই এতকাল কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন সবকটি সরকারই উত্তর-পূর্বের সমস্যা নিয়ে ছিল উদাসীন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিয়ে সক্রিয় হওয়ায় মণিপুরের মানুষ বিজেপির প্রতি তাদের সমর্থন ভোটবাক্সে ব্যক্ত করেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে একটিও আসন না পাওয়া ভারতীয় জনতা পার্টি এবার ৩৫ শতাংশ আসন (৬০ এর মধ্যে ২১) জিতেছে। শাসকদল কংগ্রেস গতবারের ৪৭-এর জায়গায় মাত্র ২৮টি আসনেই থেমে গেছে।

তবে সাফল্য যতই শিখরস্পর্শী হোক, জনগণমন বুঝতে ভুল করলে সেই সাফল্য অতলস্পর্শী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে সময় লাগে না বিন্দুমাত্র। চারিদিকে বিজেপির জয়জয়কারের মধ্যে পঞ্জাবের ব্যর্থতা সেই শিক্ষাই দেয়। বিমুদ্রীকরণের ফলে পঞ্জাবের অধিবাসীরাও উপকৃত হয়েছিল এবং তার প্রভাবও পড়েছিল বিমুদ্রীকরণ-পরবর্তী চণ্ডীগড় পুরসভার নির্বাচনে। কিন্তু পঞ্জাবের রাজ্যসরকারের ব্যর্থতার কারণে সেখানকার জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে বিজেপিকে।

জোটসঙ্গীচ্যুত অবস্থায় একক শক্তিতে ভোটযুদ্ধে লড়াই করে গোয়ায় ত্রিশঙ্কু অবস্থা, তবে বিমুদ্রীকরণের ও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য অর্থনৈতিক নীতি সেখানকার জনগণকে সন্তুষ্ট যে করেছে তার প্রমাণ আসন সংখ্যা কমলেও গতবারের তুলনায় এবারে বিজেপি'র শতাংশের বিচারে বেশি ভোটপ্রাপ্তি।

নির্বাচনী ফলাফল তো রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে পালাবদল আনল কিন্তু জাতীয় অর্থনীতিতে এই নির্বাচনী ফলাফল কী প্রভাব ফেলবে? বিশ্লেষণে দেখা যাক্।

প্রথমত, এই নির্বাচনের পরে সংগঠিত হতে চলা রাজ্যসভা নির্বাচনে বিজেপি অধিকতর শক্তিশালী হতে চলেছে। ফলে এতদিন ধরে রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার জন্য যে সমস্ত অর্থনৈতিক সংস্কার সরকার করতে পারছিল না সেগুলি এখন করবে। ফলে নতুন অর্থনৈতিক দিগন্তে সহজেই প্রবেশ করবে দেশ। এছাড়াও উত্তরপ্রদেশের মতো বড় প্রদেশে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল মসনদ পাওয়ায় অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয় অনেক ভাল হবে, যা আখেরে ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তিকেই আরও মজবুত করবে।

দ্বিতীয়ত, হিমালয়ের কোলে অবস্থিত উত্তরাখণ্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হলো পর্যটন। সে দিকে চেষ্টাও হয়েছে অনেক, কিন্তু লাগামছাড়া প্রকৃতি ধ্বংসের দ্বারা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে সেখানে যে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পর্যটন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সেখানে হচ্ছে তা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন এবং পরিবেশ ও ভারসাম্য বজায় রেখে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে না। সেখানকার উন্নয়ন করতে হলে 'ডেভলপমেন্ট' বা 'উন্নয়ন'-এর পাশ্চাত্যের দেখানো পথে না চলে স্বদেশি পদ্ধতিতে 'Sustainable Development' বা 'স্থায়িত্বপূর্ণ উন্নয়ন'-এর দ্বারা পরিবেশের এবং স্থানীয় মানুষের চিরাচরিত অর্থনৈতিক অভ্যাসের ভারসাম্যকে বজায় রেখেই করতে হবে এবং সেই পদ্ধতিতে উন্নয়ন করতে পারবে তারাই যারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতো স্বদেশি ভাবধারায় বিশ্বাসী সংগঠনের অনুগামী। উত্তরাখণ্ডে বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ায় এবার উত্তরাখণ্ডবাসী সেই উন্নয়নের স্বাদ উপভোগ করবেন যে উন্নয়ন পর্যটনে বিপ্লব এনে স্থানীয় অর্থনীতির বৃদ্ধি ঘটাবে কিন্তু প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ডেকে আনবে না।

তৃতীয়ত, উত্তর-পূর্বের মণিপুরে বিজেপি শক্তিশালী হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি) নিয়েছে তা বাস্তবায়িত হবে এবং এই অঞ্চলের খনিজ ও বনজ সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার এই অঞ্চলের ও সামগ্রিকভাবে গোটা ভারতের অর্থনৈতিক চালচিত্রকে বদলে দেবে আশা করা যায়। এছাড়াও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দ্বারা সৃষ্ট নানান সমস্যায় জর্জরিত এ অঞ্চলে অখণ্ড ভারতের আদর্শে বিশ্বাসী দলের নির্বাচনী শ্রীবৃদ্ধি বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা দমন করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে যার ফলে পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতিই।

রাজনীতি ও অর্থনীতি যখন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে, রাজনৈতিক জয় যখন ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পথ প্রস্তুত করে তখনই দেশের ভাগ্যাকাশে নব ঊষার সূচনা হয়েছে বলা যায়। সেই ঊষালগ্নে আজ সমাগত হয়েছে আপামর ভারতবাসী— আর্থ- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নব সূর্যোদয় দেখার অপেক্ষায়। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না। টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

মমতার ব্ল্যাকমেলিং আর চলবে না

সন্দীপ চক্রবর্তী

বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে নোটবন্দি ও আধার কার্ডের বাধ্যতামূলক নথিভুক্তিকরণের ইস্যুতে লাগাতার বিষোদ্গারের পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্চর্যরকমের ভদ্র ও বিনয়ী হয়ে উঠেছেন। উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে বিজেপির আকাশচুম্বী সাফল্য এবং ক্রমশ দেশের সর্বাপেক্ষা প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হয়ে ওঠা যে এর জন্য দায়ী সেকথা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবার সময় তিনি দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণতার তুলনায় কেন্দ্র ও রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের ওপর বেশি গুরুত্ব দেন। অশ্রুতপূর্ব শান্ত ও সংযত ভঙ্গিতে বলেন, 'আমরা চাই কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক সুষ্ঠু বোঝাপড়ার মাধ্যমে গড়ে উঠুক। রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসে আর চলেও যায়। সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যেন তার আঁচ না লাগে। গণতন্ত্রের প্রধান শর্তই হলো রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ।' কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁর বহুচর্চিত অভিযোগগুলি মমতা পেশ করেন অ-মমতাসুলভ সম্ভ্রমের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আধার কার্ডের বাধ্যতামূলক নথিভুক্তি প্রসঙ্গে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। কেন্দ্র মিড ডে মিল, ১০০ দিনের কাজের মতো প্রকল্পও আধার কার্ডের আওতায় আনতে চাইছে, এটা কী করে সম্ভব? আধার কার্ড রেজিস্ট্রেশন করব না একথা আমরা বলছি না। তবে রেজিস্ট্রেশনের চক্করে পড়ে গরিব মানুষ যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হন সেটা নিশ্চিত করা দরকার।'

প্রায় চার দশকের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছেন, যে ব্ল্যাকমেলিং-এর রাজনীতি ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তিনি করে আসছেন তা আর চলবে না। রাজ্যসভায় বিজেপির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মমতা যে শুধুমাত্র কেন্দ্রের একাধিক জনমুখী প্রকল্প আটকে দিয়েছেন তাই নয়, সরকারকেও বহুবার বিড়ম্বনায় ফেলেছেন। কিন্তু পাঁচ রাজ্যে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে ঐতিহাসিক সাফল্যে ভর করে বিজেপি রাজ্যসভায় তাদের শক্তি যথেষ্টই বাড়িয়ে নেবে। তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনের কোনো প্রয়োজনই আর থাকবে না। তাই মমতা সৌজন্যের মুখোশ পরেছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে মুখোশের আড়ালে রয়েছে মমতা-সহ গোটা তৃণমূল কংগ্রেসের আতঙ্ক। এই প্রসঙ্গে শিবাজীপ্রতিম বসু বলেন, 'মমতার বিনয়ের মধ্যে অনেকেই সিবিআই-আতঙ্ক লক্ষ্য করে থাকবেন। তবে সব কিছুই নির্ভর করছে নরেন্দ্র মোদীর ওপর। কারণ অতীতে তিনি বহুবার মমতার সাহায্য নিয়েছেন।' প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'নির্বাচনী এই ফল আমার মতে মমতার পক্ষে বিপজ্জনক। উত্তরপ্রদেশের সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে এখন আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে। যদি সপা-কংগ্রেস জোট জিতত তাহলে মমতা বিজেপিকে আক্রমণ করার সুযোগ পেতেন।'

এমনিতেই তৃণমূলের অনেক নেতা-মন্ত্রী সাংসদ-বিধায়ক চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে গলা পর্যন্ত ডুবে আছেন। তাপস পাল সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জেলে, মদন মিত্র জামিনে মুক্ত। এই অবস্থায় বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি ভয়ের কারণ বই কী! তৃণমূল নেতাদের চোখেমুখেও সেই ভয়ের চিহ্ন স্পষ্ট। একটা ধারণা সুকৌশলে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল যে নরেন্দ্র মোদী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোপন আঁতাতের ফলে সিবিআই আর তত গা লাগিয়ে তদন্ত করছে না। এর প্রতিবাদে রাজ্য বিজেপি সিবিআই অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জানা যায়, পর্যাপ্ত আধিকারিক না থাকার কারণে সি বি আইয়ের তদন্তে গতি আনা যায়নি। পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন শেষ হলে কেন্দ্র এ ব্যাপারে নজর দেবে।

তবে চিটফান্ড কেলেঙ্কারির থেকেও নারদা কাণ্ড সম্ভবত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের আরও বেশি মাথাব্যথার কারণ

হয়ে উঠতে চলেছে। কলকাতা হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই নারদা কাণ্ডের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। সেই সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে এই কেলেঙ্কারির মাথা এক আইপিএস অফিসারকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রায় ডজন খানেক নেতামন্ত্রী এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত। সিবিআই তদন্ত হলে এরা বিপদে পড়বেন। এইসব নেতাদের মধ্যে রয়েছেন সৌগত রায়, শুভেন্দু অধিকারী, সুলতান আহমেদ, অপূর্ব পোদ্দার, কাকলি ঘোষদস্তিদার, প্রসূন ব্যানার্জি, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র, ইকবাল আহমেদ, শোভন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নারদ নিউজ ডট কম-কৃত স্টিং অপারেশনের ভিডিওতে এদের প্রত্যেককে খোলাখুলি ঘুষ নিতে দেখা গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ভিডিওটিকে জাল বলে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। ফলস্বরূপ হাইকোর্ট ফরেনসিক পরীক্ষার নির্দেশ দেয়। সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি জানিয়েছে ভিডিওটি জাল নয়। সিবিআই তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে তৃণমূল নেতানেত্রীদের শাস্তি কেউ ঠেকাতে পারবে না। একসঙ্গে এতজন নেতার শাস্তি হলে রাজ্য সরকার যে সাংবিধানিক সঙ্কটের মুখোমুখি হবে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কার্যত অসম্ভব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াকু মানসিকতার কথা সকলেই জানেন। কিন্তু যেভাবে তার পায়ের নীচের মাটি ক্রমশ পিচ্ছিল হয়ে উঠছে, তাতে ২০১৮-য় অনুষ্ঠিতব্য পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তার দল যে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। প্রধান চ্যালেঞ্জার হবে বিজেপি। ইতিমধ্যেই তারা ব্লকে-ব্লকে তৃণমূল সরকারের আমলে ঘটা একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে। সিবিআই তদন্ত এবং অভিযুক্তদের শাস্তি যে তাদের উদ্যম বাড়িয়ে দেবে সেকথা বলাই বাহুল্য।

মমতার সঙ্কট আরও বাড়িয়ে দিয়েছে মুসলমানদের একাংশের তার প্রতি অনাস্থা। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে কোনো মুসলমান প্রার্থী না দেওয়া সত্ত্বেও, মুসলমান জনতার (প্রায় ১০ শতাংশ) সমর্থন আদায় করে নিয়ে বিজেপি সারা দেশে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চললে যে তথাকথিত নন-পপুলিস্ট রাজনীতি করেও মানুষের চোখের মণি হয়ে ওঠা যায় তার প্রমাণ নরেন্দ্র মোদী। তুলনায় মমতা তোষামোদি রাজনীতিতে অভ্যস্ত। মুসলমানরাই তার ভরসা। তাদের তুষ্ট রাখতে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষায় একুশশো কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। অন্যদিকে সাধারণ পাঠক্রমের পাঠ্যপুস্তকে রামধনু কেটে রংধনু করে দেন। আকাশ হয়ে যায় আসমান। বাবা আব্বু আর মা আম্মি। তবুও মুসলমানরা চোখ রাঙাতে ছাড়ে না। মমতার পাশে বসেই কেউ কেউ বলেন, মুসলমানরা তাকে তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। সমঝে না চললে ক্ষমতা থেকে টেনে নামাতে তাদের বেশি সময় লাগবে না। এদেশে প্রচলিত অনেক রাজনৈতিক আপ্তবাক্যের অন্যতম--- মুসলমানরা ভোট না দিলে নাকি নির্বাচনে জেতা যায় না আর সেই ভোট পেতে হলে নির্বিচারে মুসলমান তোষণ করতে হয়— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিশ্বাসে আস্থা রেখে আজীবন তোষণই করেছেন। অথচ উত্তরপ্রদেশে বিজেপির তুমুল জয়লাভের প্রেক্ষিতে ত্বহা সিদ্দিকি সম্প্রতি হুমকি দিয়েছেন, 'বিজেপি জুজু দেখিয়ে মুসলমানদের আর বোকা বানানো যাবে না। তৃণমূল সরকার যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে তা হলে তাদেরও হাল সপা-বসপা-কংগ্রেসের মতো হবে।' সুতরাং মমতার এখন উভয়সঙ্কট। একদিকে বেলাগাম দুর্নীতির কারণে শাস্তির ভয় অন্যদিকে মুসলমানদের ব্ল্যাকমেলিং। এরপর যদি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হয়ে যায় এবং তার দরুন তিন তালাক প্রথা রদ হয় তাহলে তার ঢেউ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজেও এসে পৌঁছবে। এই বহুমাত্রিক চাপ মমতা কীভাবে সামলান বা আদৌ সামলাতে পারেন কিনা সেটাই এখন দেখার। সবশেষে বামপন্থীদের কথা। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের কপালে কোনো আসন জোটেনি। জুটবে না জানাই ছিল। ১৯৮৯ সালে বামপন্থী প্রার্থী সুভাষিণী আলি কানপুর থেকে জিতলেও, ২০০২, ২০০৭ এবং ২০১২-তে বামেদের ভোট-শতাংশ যথাক্রমে ০.১৬, ০.১২ ও ০.২২। এবারেও তথৈবচ, ০.১৫। ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গেও বিধানসভা নির্বাচনে বামেরা পেয়েছিল ২৫.৯ শতাংশ ভোট। ২০১১ সালে পেয়েছিল ৩৮.৫ শতাংশ ভোট। বোঝাই যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বামেদের ভোট কমছে। উত্তরপ্রদেশে বিজেপির সাফল্য এবং সর্বোপরি নরেন্দ্র মোদীর বাস্তবানুগ নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলির বিপর্যয় আরও বাড়িয়ে তুলবে। লক্ষ্মণ শেঠ ইতিমধ্যেই দল ছেড়েছেন। তাঁর মতো বহু মধ্যম পর্যায়ের নেতা এখন বিজেপির দিকে ভিড়বেন। এটাই রাজনীতির খেলা। এ খেলায় কেউ ডুবতে বসা জাহাজে থাকতে চায় না। এমনকী পুরনো দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করে ফুটো জাহাজ মেরামতির ব্যাপারেও কেউ আগ্রহ দেখায় না। ইতিমধ্যে সিপিএমের অনেক সাধারণ কর্মী, যারা ২০১১-র পালাবদলের পর তৃণমূলের বদলার রাজনীতির ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে পারছিলেন না, বিজেপিতে যোগ দিতে শুরু করেছেন। ভবিষ্যতে এদের সংখ্যা আরও বাড়বে। মালদহ মুর্শিদাবাদ দিনাজপুরের মতো জেলায় যেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় ভারী সেখানকার হিন্দুরা সিপিএমের ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে বিজেপিতে আসছেন। মালদহের বৈষ্ণবনগরে বিজেপি প্রার্থীর জয়লাভ তার প্রমাণ।

সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সম্ভাবনা যথেষ্টই উজ্জ্বল। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সাফল্য সেই সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতরো করে তুলেছে। তবে এর সুফল ঘরে তুলতে হলে বিজেপিকে ব্লকে-ব্লকে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সব থেকে বড়ো সমস্যা হলো তাদের কাছে কোনো রাজনৈতিক বিকল্প নেই। যেদিন তারা বিজেপির মধ্যে এই বিকল্পের সন্ধান পাবেন সেদিন পশ্চিমবঙ্গে না থাকবেন মমতা, না থাকবে সিপিএম। ■

রাজ্যসভায় কং-কমিউনিস্টের মাতব্বরির দিন শেষ

অভিমন্যু গুহ।। উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে নিরঙ্কুশ জয়, গোয়া-মণিপুরে শরিকদের সহযোগী করে সরকার গঠন নিঃসন্দেহে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে আরও বেশি শক্তিশালী করবে এবং ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনেও যে বিপুল মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা দেবে তা বলাই বাহুল্য। তবে মোদী-অমিত শাহের স্বস্তির অন্যতম কারণ হলো এর ফলে আগামী এক বছরের মধ্যেই রাজ্যসভায় বিজেপির আসনসংখ্যা বেশ কিছুটা বাড়বে এবং গত লোকসভায় বিজেপির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরেও বিরোধীরা একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ বিল রাজ্যসভায় যেভাবে আটকে দিতে পেরেছিল প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যা না থাকার কারণে সেই পরিস্থিতি থেকেও মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও ঘোলাজলে মাছ ধরতে উদ্যোগী হয়েছিল বিরোধীরা। সবক'টি রাজ্যেই তবে মূলত উত্তরপ্রদেশের জনাদেশ এদের এই অপচেষ্টা ভেস্তে দিয়েছে।

ভোট ফলাফলের নিরিখে উত্তরাখণ্ডে বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কিংবা গোয়া-মণিপুরের সরকার গঠন বিজেপির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হলেও উত্তরপ্রদেশে বিপুল জয়ের তাৎপর্যই আলাদা। কারণ দেশের বৃহত্তম এই জনবহুল রাজ্যে জয় মানেই রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা এক ধাক্কায় বেশ খানিকটা বেড়ে যাওয়া এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও বিজেপি- মনোনীত প্রার্থীকে বেশ কয়েক যোজন এগিয়ে দেওয়া। বর্তমানে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ২৪৫; এর মধ্যে ২৩৩ জন নির্বাচিত, ১২ জন মনোনীত। এখন বিজেপির সদস্য ৫৬। যা কংগ্রেসের (৫৯) থেকেও তিন কম। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই নরেন্দ্র মোদীর 'কংগ্রেস-মুক্ত ভারতবর্ষ' গঠনের ডাকে দেশবাসী সাড়া দেওয়ার পর থেকেই একমাত্র পঞ্জাব বাদে গোটা দেশের সঙ্গে রাজ্যগুলোও কংগ্রেসমুক্ত হচ্ছে। কিন্তু রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এবং তার ছাতার তলায় আসা কমিউনিস্ট ও অন্যান্য সুযোগ-সন্ধানীরা রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে প্রথম তিন বছর মোদী সরকারকে যেভাবে বিব্রত করার সুযোগ খুঁজছিল তাদের সুখের দিন সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে শেষ হওয়ার পথে। এনডিএ-র দিক থেকে ভাবলেও এই মুহূর্তে তাদের রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ৭৯। যা ম্যাজিক সংখ্যা (১২৬)-র থেকে অনেকটাই কম।

তবে পরিস্থিতি যে ধাপে ধাপে বদলাবে তার কিছু তথ্য নজরে পড়ছে। যেমন আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে দশটি রাজ্যসভার আসন খালি হবে। যার মধ্যে এখন সমাজবাদী পার্টির দখলে ৬টি, বিএসপি-র দখলে ২টি (যার মধ্যে একটি আবার স্বয়ং মায়াবতীর) এবং কংগ্রেস ও বিজেপির ১টি করে আসন রয়েছে। ওই নির্বাচনে বিজেপির আসন সংখ্যা এক লাফে এক থেকে আটে পৌঁছবে। এ বছর উত্তরাখণ্ড ও গোয়াতেও একটি করে রাজ্যসভার আসন খালি হবে। সে দুটিও বলা বাহুল্য বিজেপির দখলে আসবে। সবমিলিয়ে আগামী বছরে ১২টি রাজ্যসভার আসনের নির্বাচনে বিজেপির দশটি আসনে জয় অবশ্যম্ভাবী। সেক্ষেত্রে একদিকে তারা যেমন রাজ্যসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা লাভ করবে, অন্যদিকে এনডিএ-ও ক্রমশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

রাজ্যসভার আড়াইশো সদস্যের মধ্যে ৩১ জন উত্তরপ্রদেশের। এর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে ধাপে ধাপে অন্তত ২৬টি আসনে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনা। এবং আগামী দু-তিন বছরে বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ভালো ফল করলে ও আগামীতে দিল্লি-বিহারের মতো রাজ্যগুলিতে জয়লাভ করলে ভবিষ্যতে শুধু রাজ্যসভায় বৃহত্তম দলই নয়, লোকসভার মতো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার মর্যাদাও লাভ করতে পারে। তবে খুব দূরের কথা ছেড়ে দিলেও ২০১৯-এর মধ্যে রাজ্যসভার ৭৯টি আসনে নির্বাচন হবে। যার মধ্যে বিজেপির দখলে ২৩টি, কংগ্রেসের ২১টি ছাড়াও তৃণমূল, সিপিএম, জনতা দল (সংযুক্ত) ও জনতা দল (সেকুলার)-এর কিছু আসন রয়েছে। এগুলির মধ্যে অন্তত ৪৫ থেকে ৫০টি আসনে বিজেপি ও এনডিএ শরিকরা জয়ী হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে এটুকু স্পষ্ট যে অদূর ভবিষ্যতে রাজ্যসভায় বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তো বটেই, এনডিএ-ও ম্যাজিক সংখ্যার অনেকটাই নিকটবর্তী হবে।

একই প্রতিক্রিয়া হবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি এদেশে বেশ জটিল। সারা দেশের বিভিন্ন বিধানসভার ৪১২০ জন বিধায়ক ও লোকসভা-রাজ্যসভা মিলিয়ে ৭৭৬ জন সাংসদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভাগ্য স্থির হয়। তবে এঁদের একটিমাত্র ভোটই থাকে না। এঁরা কত জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করছেন জনঘনত্ব ইত্যাদি বিচার করে তা নির্ধারিত হয় এবং সেই মতো একজনের ভোটসংখ্যা স্থির হয়। এই জটিল হিসেবের নিরিখে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মোট ভোটের সংখ্যা ১০ লক্ষ, ৯৮ হাজার ৮৮২টি। ম্যাজিক সংখ্যায় পৌঁছতে গেলে চাই ৮৩ হাজার ৮২৪টি ভোট। সংখ্যার নিরিখে এনডিএ প্রায় ২৫ হাজার মতো ভোটে এতদিন পিছিয়ে ছিল।

উত্তরপ্রদেশ-সহ চার রাজ্যে সাম্প্রতিক বিপুল জয় এই ঘাটতি তো পুষিয়ে দিলই, এমনকী সুযোগমতো ঝোপ বুঝে কোপ মারার নীতি এতদিন যে এনডিএ শরিকেরা নিয়েছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাদের ওজর-আপত্তিও গ্রাহ্য না করার জায়গায় বিজেপি পৌঁছে গেল। ■

এই সময়

শঙ্কিত চীন

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে চারটিতে বিজেপির জয়লাভে চীন শঙ্কিত বোধ করছে।

চীনের সরকারি মিডিয়া 'গ্লোবাল টাইমস'-এ এই আশঙ্কা প্রতিফলিত হয়েছে। চীনের প্রতি ভারতের বিদেশনীতি কী হবে তা নিয়ে সাউথব্লকের উপর চাপ প্রয়োগের কৌশল এখন আরও কঠিন হয়ে যাবে বলে বেজিং মনে করছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মজবুত স্থিতিকে আশঙ্কার চোখে দেখছে বেজিং।

সাইবার অপরাধ

জঙ্গি কার্যকলাপ-সহ সাইবার অপরাধ রুখতে ১২ থেকে ১৬ মার্চ আমেরিকায় হনুলুলুতে

'ডিজিটাল ক্রাইম কনসার্টিয়াম' শীর্ষক এক আলোচনা সভা হয়ে গেল। ভারত-সহ বিশ্বের প্রথম সারির ৪০টি দেশ এতে অংশ নেয়। সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য দেশের গণ্ডি যাতে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় তা নিশ্চিত করতেই এই ধরনের আলোচনা সভা।

শপথ নিলেন রাওয়াত

ত্রিবেন্দ্র সিংহ রাওয়াত উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন। এর আগে তিনি উত্তরাখণ্ডে বিজেপি সরকারের কৃষিমন্ত্রী ছিলেন। ২০১৪ লোকসভা ভোটের সময় থেকেই বিজেপি সভাপতি অমিত শাহর সহযোগী হিসাবে উত্তরাখণ্ডে তিনি কাজ করেছেন। বিধান পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি জানান, তাঁর সরকার হবে দুর্নীতিমুক্ত। দারিদ্র্য দূরীকরণই হবে প্রাথমিক কাজ। রাওয়াতয়ের বয়স এখন ৫৬।

সমাবেশ -সমাচার

কেরলে স্বয়ংসেবকদের হত্যার প্রতিবাদে জেলা শাসককে স্মারকলিপি

কেরলে সিপিএমের আর এস এসের স্বয়ংসেবকদেরকে নির্মম ভাবে হত্যার প্রতিবাদে 'মানবাধিকার রক্ষা মঞ্চ' বীরভূম জেলা শাখার নেতৃত্বে গত ৬ মার্চ জেলা শাসককে একটি স্মারক লিপি জমা দিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ওইদিন বেলা ২টার সময় দক্ষিণ বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রাম-শহর থেকে প্রায় তিন হাজার পুরুষ-মহিলা হাজির হ'ন সিউড়ী শহরে। সিউড়ি পুলিশ লাইনের সামনের চাঁদমারি ময়দান থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি পুরো সিউড়ী শহর পরিক্রমা করে

জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে পৌঁছয়। শহর পরিক্রমার সময় শহরের মানুষের আন্তরিক সহায়তা উৎসাহ জোগায়।

মিছিলের প্রথম সারিতে ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. চক্রধর ত্রিপাঠী, অধ্যাপক অজয় দাস, বীরভূম বিভাগ প্রচারক উত্তম কুমার মণ্ডল, বীরভূম বিভাগ কার্যবাহ শিবাজীপ্রসাদ মণ্ডল, দক্ষিণ বীরভূম জেলা সঙ্ঘচালক তোলারাম মণ্ডল, দক্ষিণ বীরভূম জেলা সহ-প্রচার প্রমুখ পার্থসারথি সাধু প্রমুখ। জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বক্তব্য রাখেন শিবাজীপ্রসাদ মণ্ডল। উল্লেখ্য, কলকাতা-সহ সমস্ত জেলায় জেলা শাসককে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মঙ্গলনিধি

গত ১৩ মার্চ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারুইপুর জেলা সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালী ও রীতা মালীর কন্যা কোয়েলের শুভ বিবাহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান প্রচারক কেশব দীক্ষিৎ। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু, সহ-প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ প্রচারক অর্জুন মণ্ডল ও অন্যান্য বিভাগেরও বেশ কয়েকজন বিভাগ প্রচারক। স্বস্তিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য, হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সম্পাদক স্বরূপ দত্ত। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলার অনেক কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক। অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি সম্পর্কে জেলা কার্যবাহ স্বপন সাহার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর কর্ণধার মালী তার কন্যা ও জামাতার হাত দিয়ে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন সমাজ সেবা ভারতী দক্ষিণবঙ্গের কার্যকারী সভাপতি শিবদাস বিশ্বাসের হাতে। শ্রীবিশ্বাস ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী নব দম্পতিকে আশীর্বাদ করেন।

কর্ণাটকে স্বয়ংসেবক খুন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা, বিজেপি কাউন্সিলর এবং জনজাতি নেতা শ্রীনিবাস প্রসাদকে সম্প্রতি কর্ণাটকে হত্যা করা হয়েছে। এই নিয়ে কর্ণাটকে গত দু' বছরে ১০ জন স্বয়ংসেবক খুন হলেন।

খবরে প্রকাশ, শ্রীনিবাস প্রসাদকে পুরোপুরি জিহাদি কায়দায় হত্যা করা হয়। পুলিশ এখনও পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনার পিছনে কোনো জঙ্গিগোষ্ঠীর হাত আছে বলে পুলিশের সন্দেহ।

দাসপ্রথার সমর্থক ইসলাম

দাসপ্রথা বহুদিন হলো উঠে গেছে। কিন্তু

হজরত মহম্মদ দাসপ্রথার সমর্থক ছিলেন এবং নিজেও ক্রীতদাস রাখতেন, এই অজুহাতে ইসলামিক স্টেট ২০১৭ সালে আবার দাসপ্রথা ফিরিয়ে আনতে চায়। সম্প্রতি তারা কয়েকজন বন্দি মহিলাকে এক প্যাকেট সিগারেটের থেকেও কম দামে দাস কেনাবেচার হাটে বিক্রি করেছে। প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও ইসলামি বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এর পিছনে কোরানের সমর্থন আছে বলে কবুল করেছেন।

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং

মণিপুরে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন বীরেন সিং। বিধান পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি জানিয়েছেন --- অপশাসনের কারণেই কংগ্রেস ছেড়েছি। তাঁর দাবি— বিজেপি মণিপুরে শান্তির পরিবেশ কায়েম করবে। উল্লেখ্য, ২০০২-এ প্রথম মণিপুর বিধানসভায় ডেমেক্রাটিক রেভলিউ শমারি পিপলস পার্টির প্রার্থী হিসাবে তিনি নির্বাচিত হন।

আর্ত মানুষের পাশে সিউড়ী সংস্কার ভারতী

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সামাজিক সেবা কাজেও অগ্রণী সংস্কার ভারতী সিউড়ী শাখা। সম্প্রতি রাজনগর ব্লকের বনবাসী অধ্যুষিত আগোযাবাঁধি গ্রামে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডে ২৯টি বাড়ি ভস্মীভূত হয় এবং শিশুর মৃত্যু ঘটে। এই নিরন্ন, বাসস্থানহীন, অসহায় মানুষগুলির সাহায্যের উদ্যোগ নেয় সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সংস্কার ভারতী' সিউড়ী শাখা। গত ৫ মার্চ তাদের জন্য খাবার ও ত্রাণসামগ্রী নিয়ে যাবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। শাখার সভানেত্রী লোকসঙ্গীত সাম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী-সহ শাখার সদস্য-সদস্যরা গ্রামে পৌঁছে যায় খাবার, জামা কাপড় নিয়ে। সকাল থেকে রাত, তিন বেলার ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। সংস্থার সদস্যরা নিজের হাতে পরিবেশন করে সকলকে

খাওয়ান। গ্রামবাসীদের পাশে থাকার সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞ সংস্থার শিল্পীরা। স্বপ্না চক্রবর্তী বলেন, সকলের সার্বিক সহযোগিতায় প্রত্যেকে যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে তারা গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছেন। শুধু সাংস্কৃতিক চর্চা নয়, সামাজিক কাজে আরও বেশি করে এগিয়ে আসা তাদের কর্তব্য বলে মনে করেন।

হিলির মুরারীপুরে শহিদ স্মরণ

গত ১৬ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি খণ্ডের মুরারীপুরের শহিদ স্বয়ংসেবক প্রশান্ত মণ্ডলের স্মরণে বার্ষিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকাল ৯ টায় ১০০ জনের সাইকেল শোভাযাত্রা বের হয়। পরে বিকালে এক স্মৃতিচারণ সভায় উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ-সম্পর্ক প্রমুখ প্রদীপ সাহা, দিনাজপুর বিভাগের সহ-বিভাগ প্রচারক গৌরাঙ্গ দাস, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ-বৌদ্ধিক প্রমুখ উদয়শঙ্কর সরকার, উত্তরবঙ্গ আরোগ্য ভারতী প্রমুখ অমিয় মাহাত, উদয় প্রামাণিক প্রমুখ স্মৃতিচারণ করেন। শতাধিক মানুষ কার্যক্রমে যোগ দেন।

মঙ্গলনিধি

গত ১৪ মার্চ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা শারীরিক প্রমুখ দীনেশ মাইতি'র শুভ বিবাহের বধূবরণ অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন তাঁর বাবা পুণ্ডরীকাক্ষ মাইতি ও মা শ্রীমতী গৌরী মাইতি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে মঙ্গলনিধি গ্রহণ করেন জেলা সঙ্ঘচালক অসিত খামারি। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রচারক কাজল মণ্ডল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত ঘোষ প্রমুখ গৌরাঙ্গ খাঁড়া ও সহ-ঘোষ প্রমুখ স্বপন ঘোষ। অনুষ্ঠানে বিভাগ কার্যবাহ প্রকাশ মণ্ডল-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়

চীনের শিয়রে শমন

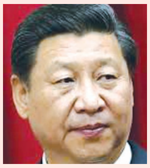

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুযোগ বুঝে ইসলামিক স্টেট সেই দিকে হাত বাড়িয়েছে। এতে বিপদ বুঝেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং জি জিনপিং-ও। সম্প্রতি স্বশাসিত প্রদেশ নিংজিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকের মুখে শোনা গেছে মার্কিন রাষ্ট্রপতির প্রশংসা। তিনি বলেন, 'এই জন্যেই ট্রাম্প মুসলমানদের আমেরিকায় ঢুকতে দিতে চান না। ইসলামি মৌলবাদ রুখতে এছাড়া কোনো উপায় নেই।'

ভারতে উটপাখির জীবাশ্ম

২৫ হাজার বছর আগে ভারতে পাওয়া যেত উটপাখি। গবেষকদের দাবি, আফ্রিকার আদি বাসিন্দা হলেও, বিভিন্ন সময়ে ভূবিজ্ঞানী ও প্রত্ন- তত্ত্ববিদেরা ভারতে অস্ট্রিচ বা উটপাখির ডিমের জীবাশ্ম খুঁজে পেয়েছেন। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশেই তা উদ্ধার হয়েছে। সম্প্রতি প্রাপ্ত উটপাখির ডিমের খোলার জীবাশ্মের ডিএনএ পরীক্ষা করা হয় হায়দরাবাদের সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি (সিসিএমবি)-তে। সংস্থার প্রধান কুমারস্বামী থঙ্গরাজ জানান, ভারতে মেলা উটপাখির ডিমের জীবাশ্মের সঙ্গে আফ্রিকার উটপাখির জিনগত মিল পাওয়া গিয়েছে।

বিশ্বব্যাঙ্কের প্রশংসা

বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতের আধার কার্ড ব্যবস্থাকে বিশ্বের সেরা বলে সার্টিফিকেট দিল। ব্যাঙ্কের সিইও পল রোমারের মতে এই ব্যবস্থা প্রত্যেক দেশের গ্রহণ করা উচিত। তিনি বলেন, 'ভারতের আধার কার্ড ভিত্তিক ব্যবস্থার থেকে ভালো কিছু আমি দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ভারতে আর্থিক লেনদেন-সহ যে-কোনো বিনিময় ব্যবস্থার ভিত্তি হলো আধার কার্ড।

পরলোকে মিহির সাহা

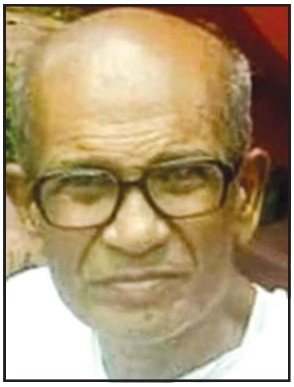

গত ১৩ মার্চ ভারতীয় জনসঙ্ঘ তথা অধুনা বিজেপির প্রবীণ নেতা এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ স্মারক সমিতি (পশ্চিমবঙ্গ)-র সম্পাদক মিহির সাহা পরলোকেগমন করেন। বেশ কিছু দিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর তিনবার বাইপাস সার্জারি হয়েছিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৮২ বৎসর। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর তিনি স্নেহভাজন ছিলেন। দিল্লির এইমসে অসুস্থ মিহিরবাবুর একবার চিকিৎসার ব্যবস্থাও করেছেন। জনসঙ্ঘ বিজেপিতে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে তিনি রাজ্য সংগঠনের অন্যতম স্থপতি ছিলেন। তিনি বরাবরই নেপথ্যে থেকে কাজ করতেন। রাজ্য বিজেপির অনেক নেতাই তাঁর হাত ধরে দলে এসেছেন। তাঁর পরিচিতি ছিল বিশাল। একজন আদর্শনিষ্ঠ নীরব পরিশ্রমী কার্যকর্তা হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বর্তমান রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কাছে বিস্ময়ের হলেও তিনি অনেকদিনই চপ-মুড়ি খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন। বাঁকুড়ায় রাজ্য বিজেপির একদা সভাপতি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হলে তিনি দলীয় কার্যে নিরন্তর পরিশ্রম করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের শাসক গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গের নির্মাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে বিস্মৃতির গর্ভে ঠেলে দিতে চেষ্টা করলেও তিনি তা হতে দেননি। আজ কলকাতার রেড রোডে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর যে প্রতিমূর্তি রয়েছে তাঁর জন্মদিনে রাজ্য সরকার-সহ সকলে যেখানে শ্রদ্ধা জানান, তা তাঁর উদ্যোগেই হয়েছে। প্রতিবছর ২৩ জুন সকালে ড. শ্যামাপ্রসাদের বলিদান দিবসে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে যে স্মরণ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, তাও তাঁরই প্রয়াসের ফল। বাংলায় শ্যামাপ্রসাদ চর্চার ক্ষেত্রে আজ যে উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে, তিনি তার প্রেরণার অন্যতম উৎস। গত ৫০ বছর ধরে স্বস্তিকা নিয়মিত ভাবে যে শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যা প্রকাশ করে আসছে তাতে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে তিনি বহু সভা-সমাবেশের উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন যথার্থ শ্যামাপ্রসাদ অনুরাগীকে হারাল। শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

দুর্গাপুরে সেবাভবন নির্মাণে করসেবা

গত ৫ মার্চ বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের ইছাপুরে সেবাভবন নির্মাণে ৩২০ জন সেবাবিভাগের ছাত্রছাত্রী, দিদিভাই-দাদাভাই ও সেবা বিভাগের কার্যকর্তারা একযোগে করসেবা করেন। ছাদ ঢালাইয়ের দিনে উপস্থিত সকলে নির্মাণ কাজে নানারকমভাবে করসেবা করেন। ৫ বছরের শিশু থেকে প্রৌঢ় সকলেই এই কাজে যোগ দেন। পরামর্শমতো সব ছাত্রছাত্রী ৫০০ গ্রাম করে চাল নিয়ে আসে এবং দুপুরের ভোজনে অংশগ্রহণ করেন। প্রবল উৎসাহে এই অভিনব কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং গ্রামের বহুলোক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দুর্গাপুর নগর সঙ্ঘচালক অশোক বোরার নিজে উপস্থিত থেকে করসেবার নেতৃত্ব দেন। সমাজসেবা ভারতীর প্রান্ত কার্যকর্তা প্রদ্যুৎমল বসু এবং প্রান্ত সেবা প্রমুখ মনোজ চট্টোপাধ্যায় করসেবাতে অংশগ্রহণ করেন। ২০০০ বর্গমিটারের এই সেবাভবন আগামীদিনে ইছাপুর অঞ্চলের আকর্ষণীয় সেবা প্রকল্পের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে বলে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস।

বিজেপির শীর্ষতম রাজনৈতিক দল হয়ে ওঠার রহস্য

অতিথি কলম

জয় পণ্ডা

> বিজেপি যদি যথার্থই ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রভূমির শীর্ষাসনে দীর্ঘস্থায়ীভাবে থাকতে চায় তাহলে তার কূটকৌশলও হতে হবে ফুল প্রুফ, যাকে বলে আঁটোসাটো। এই সুবাদে যে সমস্ত রাজ্যে তারা ভোট শতাংশে বিরোধীদের থেকে এগিয়ে রয়েছে সেখানে তাদের প্রথম কাজ— একাধিক বিরোধী দল থাকলে তাদের জোটবদ্ধ না হতে দেওয়া।

পাঁচটি রাজ্যের সাম্প্রতিক ভোট ফলাফলের পর দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি দল ভারতীয় রাজনীতিতে তাদের শীর্ষস্থানটি ধরে রেখেছে। অবশ্য এই ধরনের ঈর্ষণীয় সাফল্য আগেও বাজপেয়ী বা ২০১৪ সালে মোদীর অভাবনীয় কৃতিত্বে পরিলক্ষিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে কিন্তু কী কেন্দ্রে বা কী রাজ্যস্তরে দলকে পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে এবারের বদল কি অনেকাংশেই সম্পূর্ণ কাঠামোগত নয়? আর সেই কেবল মাত্র বাঁধা ভোটের মধ্যে আবদ্ধ থাকার অসুবিধে কাটিয়ে সমাজের বিশাল স্তরে ছড়িয়ে পড়াই তো কাঠামোগত বা অবয়বগত (পরিচিত চেহারা) বিবর্তন। তাই যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কংগ্রেস বা অন্যান্য বিরোধী দলগুলির ভবিষ্যৎ কী?

এই সূত্রে ১৯৯১ থেকে ২০০৪— সময় পরিধির মধ্যে বাজপেয়ী সরকারকে সব সময়ই কংগ্রেস-পরবর্তী জমানার সরকার মনে হোত। সেই সময় বিগত ২৫ বছর ধরে কেন্দ্র ও দেশের অনেক রাজ্যে মাঝে মধ্যেই ক্ষমতায় থাকা জোট সরকারের পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজপেয়ী জোট সরকারও অনেকটা স্বাভাবিক পরিণতি বলে মনে হোত। তবুও ২০০৪ সালের কেন্দ্রে সাধারণ নির্বাচনের সময় খুব কম মানুষই ভাবতে পেরেছিল যে বাজপেয়ী হেরে যাবেন এবং কংগ্রেসের পুনরুত্থান ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে কংগ্রেস জেগে উঠেছিল ও পূর্ণ বিক্রমে আবার দশ-দশটি বছর দেশ শাসন করেছিল।

তাহলে, আবার কি এর পুনরাবৃত্তি হবে? এক নজরে দেখলে বলা যায় আজকের কংগ্রেস নেতৃত্ব এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটানোর যোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে পঞ্জাবে তাদের সহজ জয়টিও একজন স্থানীয় প্রাচীন নেতার কল্যাণে— এখানে জাতীয় নেতৃত্বের কোনো ভূমিকা ছিল না। দেশের হৃদয়ভূমিতে দলটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে মুছে গেছে। তাদের প্রাপ্য ভোটের শতাংশও ক্ষীয়মাণ। অন্যদিকে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাহীন একক গরিষ্ঠ দল হয়েও শুধুমাত্র রাজনৈতিক অলসতা ও কূটনীতির অভাবে তারা মণিপুর ও গোয়ায় সরকার গড়তে ব্যর্থ হয়েছে।

সত্যি কথা বলতে আজকের কংগ্রেস দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সেই অর্থে রাজনৈতিক প্রজ্ঞাহীন, বাস্তব সম্পর্ক-বিরহিত ও ভুল ইস্যু নিয়ে জড়িয়ে পড়তে অভ্যস্ত। হাতের কাছের উদাহরণ দেখুন, বিমুদ্রীকরণ নিয়ে তাদের কী জাতিগত বৈরিতা অথচ এই সরকারি সিদ্ধান্ত নিচের তলার মানুষের কাছে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। হয়ত দু'টি ছোট রাজ্যে এই জনপ্রিয়তা সেখানকার অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সীর কুফলের (পঞ্জাব, গোয়া) সঙ্গে পুরোপুরি লড়তে পারেনি। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস দলের মধ্যে বহু প্রতিভাবান তরুণ তরুণীদের সুযোগ না দিয়ে বসিয়ে রাখার ফলে নেতৃত্বের উচ্চস্তরে নিছক মাঝারিয়ানার আধিপত্য তাদের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দেয়। তৈরি হয় শূন্যতা। এই শূন্যতা আম আদমি দল হয়তো পূরণ করতে পারবে এমনটা অনেকে আশা করেছিলেন। কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি। গোয়ার ক্ষেত্রে তাদের বহুল প্রচারিত অগ্রগতি সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে পড়েছে। আসন সংখ্যা শূন্য। আর পঞ্জাবের ক্ষেত্রে ঢাকঢোল পেটানো সম্ভাব্য আসনের সিকিভাগও তারা পায়নি। পরিণতিতে এখন আপকে আর কংগ্রেসের বিকল্প বলে ধরা যাবে না।

বিজেপির ক্ষেত্রে গোয়া ও পঞ্জাবে শাসনে থাকা-জনিত জন- বিরুপতার তীব্র ধাক্কা সামলেও তাদের উত্তরপ্রদেশে ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে জয় নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। এর মূল একটি কারণ ছিল ২০১৪ সালের উন্নয়নের মন্ত্রকে এবারের রাজ্য নির্বাচনেও

সার্থকভাবে প্রয়োগ করার কৌশল। এই অভিষ্ট লক্ষ্য অর্থাৎ উন্নয়নের অভিমুখ থেকে কিছুটা বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার ফলেই বিহারে ফল অত্যন্ত খারাপ হয়। উন্নয়নের জায়গায় দাদরির হানাহানির কথা বেশি প্রচার পায়। কিন্তু এখন বিজেপি আবার তার উন্নয়নের স্থির লক্ষ্যে ফিরে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা ভাবারও কোনো কারণ নেই যে এই নির্বাচনে স্থানীয় বিষয় বা উত্তরপ্রদেশের কুখ্যাত জাতপাতের সমীকরণের কোনো ভূমিকা নেয়নি। অবশ্যই নিয়েছে। কিন্তু বিজেপির নেতৃবৃন্দ নানান জাতিবর্ণের অভ্যন্তরীণ ভেদাভেদ-গুলি অন্য বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলির থেকে অত্যন্ত কুশলতায় নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছেন। অত্যন্ত ছোটদলের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ সফল চুক্তি করেছে। কিন্তু এত সবের পরেও সাফল্যের মূল চাবিকাঠিটি ছিল তরুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উদ্যোগী সকলকে এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে ভারত-উন্নয়নের কাজে লাগানোর বার্তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার মধ্যে। আমি নিশ্চিত, এরই ফলে চিরাচরিত সমর্থন ক্ষেত্র ছাড়িয়ে দল কাঠামোগত পরিবর্তনের সুফল পায়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে যুব সম্প্রদায়ের ভোটে দলের ঝুলি ভরে ওঠে। তাহলে কি সবাইকে নিয়ে উন্নয়ন করার কথা অন্য দলগুলি বলেনি? অবশ্যই বলেছে। অখিলেশের 'কাম বোলতা হ্যায়' (কাজই প্রমাণ করছে) ধ্বনি বাজারে ছিল। কিন্তু যুগব্যাপী একটি নির্দিষ্ট জাতিগত (যাদব) সমীকরণের কায়েমি স্বার্থের মধ্যে রাজনীতি চর্চা করার ফলে হঠাৎ সবাইকে নিয়ে চলার ডাক জনমনে ছাপ ফেলেনি। আদতে যাদব সম্প্রদায়ের বাইরে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়নি।

ফলাফল দেখে বিজেপির কট্টর বিরোধীদের কেউ কেউ এমন বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সকলকে নিয়ে (সব কা সাথ সব কা বিকাশ) চলার মন্ত্র অত্যন্ত কুশলীভাবে উত্তরপ্রদেশে প্রয়োগ করেছেন। ভারতের তথাকথিত উদারবাদী সাংবাদিক গোষ্ঠীর একজন হোমরা-চোমরা আমাকে একান্তে বলেছেন, এবারে অত্যন্ত মুসলমান প্রধান এলাকাতেও বিজেপি জয়ী হয়ে অনেক দীর্ঘলালিত মিথ ভেঙে দিয়েছে। এটি একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল।

এই জয়ের তীব্রতা থেকে একটা জিনিস জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে দেশের বহুধাবিস্তৃত অঞ্চলে এখন বিজেপিকে আটকাতে গেলে কোনো একটি রাজনৈতিক দলের দৌড়ে তা কুলোবে না। বহু বিষম অসবর্ণ দল গাঁটছড়া বাঁধতে পারলে তবেই টিঁকে থাকার সম্ভাবনা থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিহারের বিচক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই এই জয়ের জন্য জনতার মধ্যে বিমুদ্রীকরণের বিপুল জনপ্রিয়তার পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশে বিহারের মতো 'মহাজোটবন্ধনের' অভাবকেও চিহ্নিত করেছেন।

এখন দেখা যেতে পারে ভারতের নানান অঞ্চলে অন্য সবাই একসঙ্গে আর বিজেপি একা— এই ধরনের জোটের কেমন বাস্তব সম্ভাবনা। নৈরাশ্য, হতাশা ইত্যাকার মানসিক অবস্থা ব্যধির লক্ষণ হলেও এ থেকে অনেক সময়ই নিরাময়ের রাস্তা বেরিয়ে আসে। নিরাশাজনিত মরীয়াভাব থেকেই নতুন পথ খোঁজা শুরু হয়। উত্তরপ্রদেশে এরই মধ্যে এমন একটি আহ্বান শোনা গেছে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে শুধু সপা কংগ্রেস নয়, মায়াবতীকেও একসঙ্গে নিয়ে লড়তে হবে।

অবশ্য রাজনীতিতে উৎকট জুড়ির আবির্ভাব প্রায়শই দেখা গেছে। তবে এই ধরনের কিছু কিছু যুথবদ্ধতা নিয়ে অবিশ্বাসের প্রবণতা থেকেই যায়। যেমন ধরুন আজকের তারিখে দাক্ষিণাত্যের দুটি দ্রাবিড় দলের একত্রে সহাবস্থান বা বাংলায় সিপিএম ও তৃণমূলের একই থালায় বসে পড়াটা কল্পনার দীর্ঘ সীমারেখাকেও বিশ্বাসযোগ্যতায় ছুঁতে পারে না। হ্যাঁ, এবার অবশ্যই আমাদের বিজু জনতা দলের কথা আলোচনা করা দরকার। মনে রাখা দরকার আমাদের সমর্থনের মূল ভিত্তি কংগ্রেস বিরোধিতা যা প্রয়াত নেতা বিজু পট্টনায়ক দীর্ঘ রাজনৈতিক পরিশ্রমে নির্মাণ করে গেছেন। এই প্রক্রিয়ায় তাঁকে নানান দলের আওতায় থেকে বা বেরিয়ে এসে তবেই এগোতে হয়েছে। বিজু জনতা দলের জন্ম ১৯৯৭-৯৮ সালে। জন্মলগ্নেই আমরা বাজপেয়ী পরিচালিত এনডিএ-এর জোটসঙ্গী ছিলাম। ২০০৯ সালে এই জোট ভেঙে যায়। অন্যদিকে ওড়িশায় দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে নির্বাচনী ফলাফলে দীর্ঘ দূরত্বের তৃতীয় স্থান ছেড়ে বেরিয়ে গোটা ওড়িশা ব্যাপী সাম্প্রতিক স্থানীয় নির্বাচনগুলিতে বিপুল বিক্রমে কংগ্রেসকে পেছনে ফেলে বিজেপি প্রশংসনীয় ভাবে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে।

পূর্বতন জনতাদলের আর একটি উপশাখা জেডিইউ জন্মসূত্রে কংগ্রেস বিরোধী হয়েও বিহারে জোট সরকারে কংগ্রেসের সঙ্গে সহাবস্থান করছে। কিন্তু আমাদের বিজেডি দলে হপ্তাখানেক আগে ইউপি ভোট ও স্থানীয় নির্বাচনের পরে পরেই এক প্রবীণ সাংসদ কংগ্রেস দলের সঙ্গে জোট বাঁধার একটি প্রস্তাব বিবেচনার জন্য আনলে দলীয় সভাপতি নবীনবাবু তা পত্রপাঠ নাকচ তো করেছেনই সঙ্গে ওই সাংসদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

যাই হোক না কেন, যদি বিজেপি যথার্থই ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রভূমির শীর্ষাসনে দীর্ঘস্থায়ীভাবে থাকতে চায় তাহলে তার কূটকৌশলও হতে হবে ফুল প্রুফ, যাকে বলে আঁটোসাটো। এই সুবাদে যে সমস্ত রাজ্যে তারা ভোট শতাংশে বিরোধীদের থেকে এগিয়ে রয়েছে সেখানে তাদের প্রথম কাজ— একাধিক বিরোধী দল থাকলে তাদের জোটবদ্ধ না হতে দেওয়া।

সদ্য সমাপ্ত এই নির্বাচনে দলের আবেদনকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর যেমন জোর দেওয়া হয়েছিল তেমনি উল্লেখিত বিরোধীদের বিভাজিত রেখে দেওয়ার চাণক্য সুলভ সূক্ষ্ম চালও নজর এড়ায়নি।

(লেখক বিশিষ্ট সংবাদ ভাষ্যকার)

চিঠিপত্র

সরস্বতী শিশুমন্দিরে সরকারি চাপ

সম্প্রতি রাজ্য সরকার সরস্বতী শিশু মন্দিরগুলিকে হিন্দুত্ব প্রচারের অভিযোগে বামপন্থীদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার প্রশ্ন হিন্দুত্বের প্রচার কী সংবিধান বিরোধী? মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে বলেছেন, হিন্দুত্ব এক জীবনদর্শন। হিন্দু শব্দে কোনো রিলিজিয়ন বোঝায় না। হিন্দুত্ব শব্দ এই উপমহাদেশের জনসমষ্টির জীবন পদ্ধতির সঙ্গে অধিক সম্বন্ধযুক্ত। অপর দিকে মাদ্রাসাগুলিতে ইসলামি ধর্মীয় ও মৌলবাদী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও সেইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করার কথা বর্তমান সরকার ভাবতে পারেন না। আসলে শিক্ষা মন্ত্রীর নজর পড়েছে জনপ্রিয় এবং উচ্চমানের শিশু মন্দিরগুলির ওপর যেখানে হিন্দু মুসলমান সকল ছাত্রছাত্রী জাতীয়তাবোধের ও দেশাত্মবোধের শিক্ষা পেয়ে থাকে। সম্প্রতি অসমের এক মুসলমান ছাত্র এই বিদ্যাভারতীর শিশু মন্দির থেকেই রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেই শিশু শিক্ষার ইসলামিকরণ শুরু করেছে জোরকদমে। প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলার শিশু শিখবে যে আকাশে 'রংধনু' ওঠে— 'রামধনু' আর ওঠে না। অর্থাৎ 'রাম' নামে সাম্প্রদায়িকার গন্ধ রয়েছে, সেটি বলা চলবে না। মৌলবাদীদের তুষ্ট করার জন্য পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র বা নজরুল ইসলাম 'রামধনু' লিখে সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়েছেন, এমনই অবিবেচনা প্রসূত পরিবর্তন হয়েছে। হাওড়ার তেহট্ট হাইস্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধ করে নবি দিবস পালন করতে গেলে প্রতিবাদে পথ অবরোধ করা হয়। ফলস্বরূপ ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্যে জোটে পুলিশের লাঠির আঘাত। মৌলবাদীদের কাবু করতে না পেরে সরকারকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হয়। এই রকমভাবে সরকার যখন মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন তখন ভারতীয় মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়ার প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি, আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। সরকার পশ্চিমবঙ্গকে কি আগামী দিনে মৌলবাদীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে হিসাবে গড়ে তুলতে চাইছেন? শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জাগ্রত মানুষ সরকারের এই হঠকারিতা কোনো ভাবেই মেনে নেবে না।

—**তরুণ কুমার পণ্ডিত,**
কাঞ্চনতার, মালদা।

বিয়োগান্তক নাটকের মাঝেও শিষ্টাচার

এক অভূতপূর্ব শিষ্টাচার দেখিয়ে কানসাসের গভর্নর সাম ব্রাউনব্যাক ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়েছেন গভীর অনুশোচনা জানিয়ে। ওই চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন কানসাসের এক নেটিভ দুই ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের ওপর যে ভাবে গুলি চালিয়ে হামলা করেছে তাতে তিনি গভীরভাবে অনুতপ্ত। ওই জাতি বিদ্বেষী ব্যক্তি বর্তমানে বিচারের জন্য জেল হেফাজতে রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি এবং আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন ভারতীয়রা মার্কিন মুলুকের ওই রাজ্যে স্বাগত।

ব্রাউনব্যাক শ্রীনিবাস কুচিভোটলা এবং অলক মাডাশানির ওপর বন্দুকবাজের গুলি চালনার নিন্দা প্রকাশ্যেই করেছেন যাঁরা ওই গার্মিনের হয়ে এইচ-ওয়ান বি ভিসার ওপর কাজ করছিলেন। তাঁদের ওপর গুলি চালিয়েছে প্রাক্তন নৌ-বাহিনীর সদস্য আদম পিউরিনটন। পিউরিনটন বারে প্রবেশ করে ওই দুই ভারতীয়দের উচ্চস্বরে দেশ ছেড়ে যেতে বলে এবং প্রচণ্ড বাক্-বিতণ্ডার পর তাঁদের ওপর গুলি চালিয়ে দেয়, যার ফলে কুচিভোটলা প্রাণ হারান।

ব্রাউনব্যাক টোপেকাতে ভারতীয় কনসাল জেনারেল ড. অনুপম রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন আর এই ঘৃণ্য অপরাধের তীব্র নিন্দা করে নিজের সমবেদনা জানিয়ে এসেছেন। ব্রাউনব্যাকের প্রধানমন্ত্রীকে লেখা ৩ মার্চের চিঠিতে কুচিভোটলার স্ত্রী সুনয়না ডুমালার সাহস, অদম্য স্পৃহার কথা প্রকাশ করে তার প্রশংসা করেছেন ওই চিঠিতে। মি. ব্রাউনব্যাক লিখেছেন— কানসাসের গভর্নর হিসেবে আমি আমার দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করছি যেভাবে হিংসার দ্বারা শ্রীনু কুচিভোটলা এবং অলক মাডাশানির ওপর ওপর হামলা চালানো হয়েছে। কানসাসের সাধারণ মানুষও আমার এই মর্মবেদনা ও ত্রাসের ভাগীদার। শ্রীনুর স্ত্রীর যে বেদনা তা ভাষা বা বর্ণের মাধ্যমে প্রকাশ করা অসাধ্য। তাঁর হায়দ্রাবাদের পরিবারের সদস্যদেরও এ বিয়োগের শোক জ্ঞাপনও ভাষায় বর্ণনারও অতীত।

"শ্রীনুর মৃত্যুর পর এযাবৎ যে তথ্য আমি পেয়েছি তাতে দেখেছি শ্রীনু ছিলেন অদম্য সাহসী, আর তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে তিনি ভালবাসতেন এবং গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতেন। আমরা প্রয়াস চালাব শ্রীনুর সাহস, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাকে আদর্শ, উদাহরণ হিসেবে স্মরণে রাখতে।"

"তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বর্ণনা করত সদালাপী, প্রীতিপ্রদ ও প্রেমাস্পদ হিসেবে। তাঁর মধ্যে ছিল গভীর মেধা, শিক্ষা আর আবেগ। তাঁর এই কাহিনি কানসাসে বসবাসকারী হাজার হাজার ভারতীয় কয়েক প্রজন্ম ধরে রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে মিলে যায়।"

"এঁরা সকলেই সাফল্যের শিখরে উঠেছেন নিজেদের নির্ভেজাল কঠোর পরিশ্রম এবং দৃঢ়তায় সাহায্যে। আমাদের প্রদেশটির উন্নয়নের জন্য এঁদের অবদান প্রভূত।" ব্রাউনব্যাক সমগ্র ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে কানসাসের প্রদেশের হয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রদেশে আহ্বান জানিয়েছেন।

তাঁদের এদেশে আসার পূর্বে, সুনয়না বলেছেন, 'কানসাস ছিল তাঁর তাৎক্ষণিক

পছন্দ। আমাদের সানুনয় নিবেদন ব্যক্তিগত ভাবে সব ভারতীয়দেরই এই প্রদেশে (কানসাস) স্বাগত জানাই এবং জানাতে চাই কানসাসও তাদের স্বাগত জানায়।

—**নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য,**
নিউ ইয়র্ক।

মোদীকে অভিনন্দন

সবাইকে রাজনীতির মৌলিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানানো উচিত। কংগ্রেস তথা প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর বক্তব্য— 'নোটবন্দি মানে সুসংগঠিত লুঠ ও সরকারি মদতে চুরি'— এই বক্তব্যকে ধুলিস্যাৎ করেছেন মোদী। মোদীর ভাষায়— 'ড. সিং রেনকোট পরেই বাথরুমে স্নান করতে ভালবাসেন'। সকলেই জানেন, ড. সিং ১৯৯০-এর দশকে পি. ভি. নরসিংহ রাও মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থাকে যেভাবে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, তিনিই আবার পরবর্তীকালে শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধীর হাতের পুতুল হয়ে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করলেন। ১৯৯২-এর পর কংগ্রেস জমানায় বিভিন্ন কারণে অবমূল্যায়নের ফলে (উচ্চ মাপের দুর্নীতি, কালোটাকা, মুদ্রাস্ফীতি, দৈনন্দিন জিনিসের আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি) দেশের যা অবস্থা হয়েছে তার সমাধানের জন্য কোনো চিন্তা বা পরিকল্পনা করেনি। বাস্তবে কংগ্রেসের কাছে কোনো সদুত্তর নেই। মোদী কংগ্রেসের উদ্দেশে সঠিক কথাই বলেছেন— 'ওরা যদি নিয়ম মানেন তাহলে সাহস করে এগিয়ে এসে শিক্ষা নেওয়া উচিত।"

—**বিভূতি সরকার,**
কলকাতা-৩৮।

তোষণের রাজনীতি

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরণ রিজিজু অরুণাচল প্রদেশের সামাজিক অবস্থা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন— ধর্মান্তরণের জন্য হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে হাস্যাস্পদ ও অযৌক্তিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন কংগ্রেস নেতা মনীশ তেওয়ারি। এইসব নেতারা জেনে বুঝে না জানার ভান করেন। অরুণাচল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি দোষারোপ করেছিল যে অরুণাচলে রাজ্য সরকার (বিজেপি) ওই রাজ্যকে হিন্দুরাজ্য বানাতে চাইছে। শ্রী তেওয়ারীর জানা উচিত শ্রী রিজিজু কোন্ কথার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বলেছেন। শ্রী রিজিজু এই মাটির সন্তান। তিনি কেবল সত্য কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন— হিন্দুরা কখনও অন্য ধর্ম থেকে ধর্মান্তরণ করে না বরং বিপরীতটাই বেশি হচ্ছে। বিগত কয়েকটি জনগণনার দিকে তাকালে দেখা যাবে হিন্দুসংখ্যা সত্যিই ক্রমহ্রাসমান, আজ শ্রী রিজিজুর বিরুদ্ধে চিৎকার করার পরিবর্তে তাদের কাণ্ডজ্ঞান হারানোর জন্য কংগ্রেসেকে কেন দোষারোপ করছে না? তোষণের রাজনীতি করে দেশের আর কত ক্ষতি করতে চায় কংগ্রেস ও তার দোসররা?

—**পৃথ্বীশ চক্রবর্তী,** , হাওড়া-২।

॥ ২ ॥

গত বছর মালদার কালিয়াচক ঘটনা থেকে শুরু করে উলুবেড়িয়ার কাছে একটি স্কুলে সরস্বতী বন্দনা তথা সরস্বতী পূজা বন্ধ করা এবং ধুলাগড়ের হিন্দু বসতিতে হামলা কেবল পশ্চিম বাংলার ঘটনা নয়, সারা ভারতের চোখ খুলে দিয়েছে। এছাড়া ছোটখাট ঘটনা তো লেগেই আছে। সবক্ষেত্রে হিন্দুদের উপর আক্রমণ, দোকান লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সরকার তথা পুলিশ প্রশাসনের তুষ্টিকরণ নীতির ফলে স্থানীয় কট্টরপন্থীদের দাদাগিরি ক্রমবর্ধমান। এসবই সংখ্যালঘু ভোটের লোভে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তুষ্টিকরণের কাছে আত্মসমর্পণ। প্রতিক্ষেত্রে সরকারিভাবে কিছু না দেখার ভান করা ও পরে হিন্দুদের উপর দোষ চাপানো। এতকিছু সত্ত্বেও হিন্দুসমাজ সক্রিয় ও জাগ্রত। সমগ্র হিন্দু সমাজ চায় সরকার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখুক ও ব্যবস্থা নিক। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ চুপ করে আছে— এটা দেশের পক্ষে লজ্জাজনক ও দুর্ভাগ্যজনক। রাজ্য সরকার দোষীদের কড়া ব্যবস্থার পরিবর্তে সংরক্ষণ দিচ্ছে।

—**রাখী বেরা,** , খড়্গপুর।

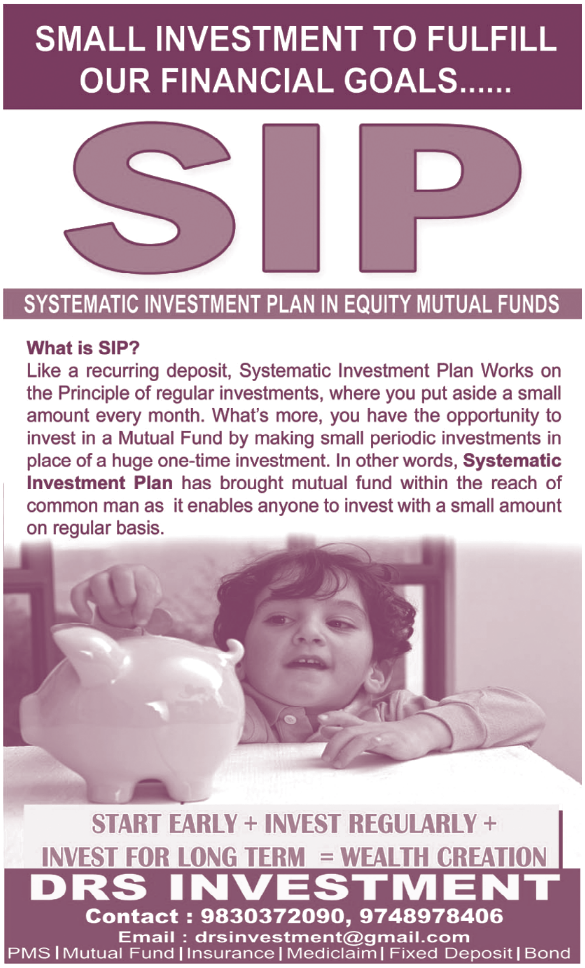

পরম্পরা

দেবী অম্বিকা

বিপ্লব বরাট

বাংলার শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র ও প্রাগৈতিহাসিক পর্বের সনাতন আর্য সভ্যতার পীঠস্থান মুকুটমণিপুর। কংসাবতী উপত্যকায় তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার অববাহিকার কেন্দ্র মুকুটমণিপুরের নামকরণের পিছনে রয়েছে জনশ্রুতি। ১৮৩২ সালে রাজা অনন্তলাল ধবলদেবের পৌত্র জগজ্জীবনের বিয়ে হয় মান রাজাদের কন্যা মুকুটমণি দেবীর সঙ্গে। বিয়ের পর ১৮৩৫ সালে একটি ভূখণ্ডকে মুকুটমণিপুর মৌজা হিসাবে ঘোষণা করেন। বউমার সম্মানার্থে, সেই মৌজা আজকের মুকুটমণিপুর জনপদ— এমনই অভিমত স্থানীয় মানুষের। এশিয়ার বৃহত্তম মাটির বাঁধ মুকুটমণিপুর ড্যাম। বাঁধের দৈর্ঘ্য ১১.২৭ কিলোমিটার, উচ্চতা ৩৮ মিটার। জেলা শহর বাঁকুড়া থেকে সোজা দক্ষিণমুখে ৪৫ কিলোমিটার গেলে মহকুমা শহর খাতড়া। সেখান থেকে আরও ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এর অবস্থান। বিস্তৃত বাঁধ দ্বারা বেষ্টিত বিশাল জলাশয় ঘিরে এর অবস্থান। শীতের মরসুমে প্রায় সমগ্র পশ্চিমবাংলা, বিহার, ঝাড়খন্ড থেকেও বহু পর্যটক এখানে পিকনিক করতে আসেন। সেই সূত্রে এখানে সরকারি আবাসস্থল, বহু প্রাইভেট হোটেল ও রেস্টুরেন্ট-এর মেলা বসে গিয়েছে। জলাশয়ে বেটিং প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। জ্যোৎস্নারাত্রে মুকুটমণিপুরের অপরূপ শোভা মনকে মুগ্ধ করে। ডিয়ার পার্ক রয়েছে।

সারেঙ্গগড় ও পরেশনাথ অবহেলিত প্রত্নস্থল :

মুকুটমণিপুর হারিয়েছে তার অতীত গৌরব। আমাদের অবহেলায় ও অনাদরে বহু মূল্যবান পুরাসম্পদ বিলুপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবুও প্রত্নমূর্তিগুলি মৌলিকত্ব বজায় রেখে আজও ধরে রেখেছে তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে। কংসাবতী প্রকল্প ১৯৫৯ সালের ২৪ জানুয়ারি মুকুটমণিপুরে কংসাবতী ও কুমারী নদীর সংযোগস্থলে বাঁধ নির্মাণের কালে পরেশনাথ-সারেঙ্গগড়-সহ অন্তত চল্লিশটি ছোটবড় প্রাচীন জনপদ সনাতন হিন্দু স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নিদর্শন ও জৈন বসতি চলে যায় জলের তলায়। ১৯২৫ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রাচীন পরিমণ্ডল পরিভ্রমণ করেছিলেন ও জৈন জনপদটির বর্ণনা দিয়ে গেছেন। সেই লেখা থেকে জানতে পারি প্রাগৈতিহাসিক উপাদান ও সনাতন হিন্দু উপাসনার কেন্দ্র ছিল এই সারেঙ্গগড়। জলাধার নির্মাণের সময় সারেঙ্গগড় থেকে নদীর পাড়ে অবস্থিত পরেশনাথ পাহাড়ে এই স্থানের বেশ কিছু প্রাচীন মূর্তি রক্ষিত আছে। বর্তমানে পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দির প্রাঙ্গণে খোলা আকাশের নিচে অবহেলায় প্রত্নবস্তুগুলি পড়ে আছে।

প্রত্ন-প্রতিমা দেবী অম্বিকা : কংসাবতী ও কুমারী নদীর সঙ্গমস্থলের ঠিক দক্ষিণে রানিবাঁধের প্রায় দশ কিলোমিটার পর একটি সমৃদ্ধ গ্রাম অম্বিকা নগর। দেবী অম্বিকার নামানুসারে 'আমাইনগর' পরবর্তীকালে অম্বিকানগর নামে পরিচিতি লাভ করে। অনন্তলাল ধবলদেও স্বপ্নাদেশে বাঁকুড়া জয়রামবাটি হতে এক পাষাণময়ী মূর্তি এনে এই গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন। এই দেবীই হলেন অম্বিকা। এমনই অভিমত স্থানীয় মানুষের। ঐতিহাসিকদের মতে 'নগর' থাকার জন্য অতীতে সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল, এখানে 'সেনেরগড়'-এ বহু প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলেন— বাংলার সেন রাজাদের অধীনে অঞ্চলটি ছিল। রাজস্থানের ক্ষত্রিয় রাজা জগন্নাথ, পৌত্র অনন্ত ধবলদেব এখানে রাজধানী করাতে অম্বিকানগরের সমৃদ্ধির ইতিহাস শুরু হয়। বিদ্বজ্জনদের মতে পশ্চিমে পরেশনাথ একদা এক সমৃদ্ধ জৈন কেন্দ্র ছিল। অম্বিকানগর-এর যে মূর্তিটি এখন দেবী অম্বিকা নামে পুজিতা হয় সেটি আসলে জৈন শাসন দেবী অম্বিকা। এই মত বেশি গ্রহণযোগ্য কারণ গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গের পাশে পাথরের খোদাই করা সুন্দর দিগম্বর জৈন ঋষভনাথের মূর্তি দেখা যায়। শিবলিঙ্গের জন্য নির্মিত এখানে জীর্ণ দেউলটি মুসলিম যুগের পূর্বকালের। মুকুটমণিপুর, অম্বিকানগর, দ্বারগেড়্যা, খাতড়ার ধবনিগ্রাম, পরেশনাথ ও এই অঞ্চলের কংসাবতী উপত্যকার জীবনধারায় জৈন রীতির সংমিশ্রণ ঘটে, এমনকী জৈন শ্রমনগণ এখানে স্থানীয় শৈব ও মাতৃরূপিণী দেবীর ভাবনায় নিজেদের সম্মিলিত করেন। অম্বিকানগরের প্রাচীন দেউল মন্দিরটি বিপ্লবী আন্দোলনের সহকর্মী রাইচরণ ধবল দেব সংস্কার করেছিলেন।

প্রত্ন-প্রতিমা দেবী অম্বিকা হলেন দুর্গা। দেবী জাগ্রত ও তার নানা মাহাত্ম্য জেলার সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্নপ্রতিমাটি পাথরের তৈরি, কিন্তু তার সিঁদুর লেপা মুখ ও উজ্জ্বল দুটি নকল চোখ ছাড়া সর্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা। দেবী অম্বিকার ডান পাশে একটি পাথরের ভগ্ন গণেশ মূর্তি, প্রত্নমূর্তি রয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ব্যবহৃত কিছু কিছু পাথরের আয়ুধ এখান থেকে পাওয়ার ফলে গ্রামের খ্যাতিও আকর ভূমি বলে পরিচিতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে। এই প্রাচীন জনপদ মুকুটমণিপুর ও অম্বিকা নগরের স্থানীয় তথা আঞ্চলিক জনবসতির চরিত্র ও ভৌগোলিক বিস্তারের নিরিখে দেখা যায় গ্রামের স্থাপত্য। দেবী অম্বিকা মন্দিরের পাশে পাথরের ভৈরব শিবের ভগ্ন দেউলটি স্বাধীনতার ৭০ বছর পরও অবহেলিত ও উপেক্ষিত যা খুবই দুঃখজনক। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বক্ষণ (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া) দ্বারা সংরক্ষিত নয়।। প্রত্নস্থলটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও প্রশাসনের যত্ন নিয়ে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

***তথ্যসূত্র :** পুরাকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—বিপ্লব বরাট, ক্ষেত্রানুসন্ধানে সাহায্যকারী শুভেন্দু দাস, বাঁকুড়ানগর।*

বাংলার লোকায়ত দেবী
দ্বারবাসিনীর বিষহরি

উজ্জ্বলকুমার মণ্ডল

প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা। হুগলির অমরাগড়ে রাজত্ব করছেন— মহীপাল। পাল রাজাদের যে নানা শাখা-প্রশাখা বাংলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল— তাঁদেরই একজন নাকি এই মহীপাল। তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ৯৮০ খ্রিস্টাব্দ।

রাজা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং ছোট রানির কথায় বড়ো রানিকে রাজবাড়ি থেকে বিতাড়িত করেন। বড়ো রানি তখন মনের দুঃখে একমাত্র ছেলে দ্বারপালকে নিয়ে নৌকা করে কেদারমতী নদী ধরে বাপের বাড়ি যাচ্ছিলেন।

গ্রীষ্মকাল। হঠাৎ আকাশে মেঘ। তারপর ঝড়। নৌকা ভিড়ল সেনেট গ্রামের অপর পারে। নদীর পাড়ে বিভিন্ন গাছপালার জঙ্গল। তারই মাঝে আদিবাসী আর ডোমদের ঘরবাড়ি। নিরুপায় হয়ে রানি আর তাঁর কিশোর ছেলে সেই ঝড়-বৃষ্টির রাতে আশ্রয় নিলেন এমনই এক আদিবাসীর ঘরে।

রানির ছেলেকে সবার ভাল লাগল। তারা তাকে বলল— তুই এখানেই থেকে যা। তুই দ্বারপাল। তুই অমরাগড়ের সদ্‌গোপ রাজার ছেলে আছিস। ঠাকুর তোকে এখানে এনেছে, তুই এখানকার রাজা হয়ে যা। আমাদের ডোমপণ্ডিত একবার বলেছিল— এখানে সদ্‌গোপ রাজা হবে। তুই আমাদের রাজা হ'। ভাগ্যবিড়ম্বিত দ্বারপাল ডোমকর্তাদের পরামর্শে সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এবং কালে তিনি সেখানে রাজ্য স্থাপন করে রাজা হয়ে গেলেন। আর এইভাবে জঙ্গলপূর্ণ, অখ্যাত অঞ্চলটি দ্বারবাসিনী রূপে আত্মপ্রকাশ করল।

নদীর তীরে গ্রাম। ঝোপজঙ্গলও যথেষ্ট। তাই সাপের উপদ্রবও প্রায়ই লেগে থাকত। রাজা দ্বারপাল সাপেদের উৎপাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য দেবী মনসার পূজা শুরু করলেন।

মতান্তরে, গ্রামের পুকুর থেকে এক মনসামূর্তি উদ্ধার হয়, তাঁকেই বিষহরি রূপে প্রতিষ্ঠা করে পূজার্চনার প্রবর্তন ঘটে। এই শিল্পমূর্তির সঙ্গে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির বেশ মিল আছে। সেই মূর্তি পূজিত হলেও এখন অবশ্য মৃণ্ময়ী প্রতিমাই বিষহরি রূপে পূজিত হচ্ছেন।

রাজা দ্বারপাল দেবী বিষহরির যে মন্দির তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, তা বহুদিন আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়েছে প্রায় দু'শো বছর আগে, বর্ধমান রাজাদের অর্থানুকূল্যে এবং লালচাঁদ ঘোষের তৎপরতায়। গ্রামের বাইরে এক ঢিপির উপর দেবীর মন্দির অবস্থিত, মন্দিরটি দালান শ্রেণীর, দক্ষিণমুখী, ১৩ ফুট উচ্চতা, একটিই দরজা। মন্দিরের মধ্যে রেলিং-এর বেড়া, তার মধ্যে বেদির উপর দেবীর অবস্থান।

দেবী দ্বিভুজা, ত্রিনয়নী, পরনে সবুজ পাড় যুক্ত লাল শাড়ি; দেবী সালঙ্কারা। হাতে শাঁখা, চুড়ি, কানে দুল, গলায় চিক, মাথায় মুকুট— সবই অবশ্য মাটির। দেবীর ডান হাতে বরসূচক মুদ্রা, বাম হাত কোলের কাছে লগ্ন, চোখ দুটি বিস্ফারিত। দেবী ললিতাসনে অর্থাৎ বাম পা-টি মুড়ে ঝুলিয়ে রাখা ডান পায়ের উপর রেখে উপবিষ্ট। দেবীর দুই কাঁধের উপর দুই সর্পশিশু।

দেবী একা নন, সঙ্গে আছেন পিতা দেবাদিদেব শিব, স্বামী জরুৎকারু এবং দুই সখী জয়া ও বিজয়া। মন্দিরের সামনে প্রশস্ত চত্বর, তার মধ্যে নাটমন্দির, টিনের ছাউনি, চারটি পিলারের মন্দিরের উপর নাটমন্দিরের ছাউনি তথা আচ্ছাদন দাঁড়িয়ে অবস্থান করছে। নাটমন্দিরের সামনে অতীতের কেদারমতী নদী, এখন যেন নালা। মন্দিরের পেছনে কাঠমল্লিকা, বেল গাছ, খুবই প্রাচীন। মন্দিরের বাঁদিকে তুলসী মঞ্চ। তাকে ছায়া দিচ্ছে এক সিমেন্টের সাপ, বহুফণা বিস্তার করে।

দেবীর বর্তমান সেবায়েতরা এখন ব্রাহ্মণ, দ্বারবাসিনী গ্রামেরই গোস্বামী পরিবার। সাধারণত নিত্যপূজার সময় বেলা এগারোটা; এই সময়ে সেনেটের বিশালাক্ষী মায়েরও নিত্যপুজো হয়ে থাকে। সাধারণত পঞ্চোপচারে নিত্যপুজো হয়, নৈবেদ্য হিসাবে আতপ চাল, ফল-মূল নিবেদিত হয়। অন্নভোগ হয় না। কেবল, বাৎসরিক উৎসবের দিন খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হয়।

আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমীতে যা নাগপঞ্চমী নামে পরিচিত দেবীর বাৎসরিক পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে এখানে মেলাও বসে। এদিন সূর্যোদয়ের পর থেকে শুরু হয় দেবী বিষহরির বিশেষ পূজার্চনা। সেবায়েতরা সকলে মিলে পুজো শুরু করে। প্রথমে, প্রধান পুরোহিত মায়ের ঘট নিয়ে সংলগ্ন দেবী পুকুরে যান। সেখানে, ঘট ধুয়ে-মুছে মেজে ঘষে পরিষ্কার করে জল ভরে মন্দিরে নিয়ে আসেন। এরপর শুরু হয় বিবিধ উপচারে পূজার্চনা। পুজো দিতে শুধু দ্বারবাসিনী গ্রামের মানুষই নয়, চারদিক থেকে আশপাশের গ্রামের মানুষরাও সমবেত হয়। পুজোর উপকরণ মন্দির চত্বরে বিক্রি হয়। কিন্তু অন্যান্য উপকরণের সঙ্গে থাকে একটি পাঁঠাও। অনেকে মানত হিসাবে দেন, অনেক পরিবারের কাছে দেবীর পুজোয় পাঁঠা বলি দেওয়ার প্রথা বংশানুক্রমে বহুদিন থেকে চলে আসছে। কিন্তু এখানকার মেলার আরেকটা বিশেষত্ব পাশের সাটিথান গ্রাম থেকে 'থাকার' আগমন। 'থাকা' বলতে বোঝায় একটি বড়ো চালার উপর বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। পূজা করে সেই থাকাকে কাঁধে করে বেশ কিছু মানুষ বহন করে মন্দির চত্বরে আসে, সেই সঙ্গে চলে নামসংকীর্তন। এরপর তারা বিষহরি মন্দির তিনবার পরিক্রমা করে। তারপর বেলা শেষে ফিরে যায় স্বগ্রামে।

তখন অন্যান্য লোকেও বাড়ির রাস্তা ধরে, কারও কাঁধে একটি আস্ত কাঁঠাল, কারও সঙ্গে দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত মুণ্ডহীন পাঁঠার ধর। ■

সুসংহত জীবনবিন্যাস এক পরম্পরাগত অভ্যাস

অমিত ঘোষদস্তিদার

ভারতবর্ষের ক্রান্তদর্শী ঋষিরা মানুষের জন্য সুসংহত জীবনবিন্যাস তৈরি করে তাকে এক পরম্পরাগত অভ্যাস-এ পরিণত করতে পেরেছিলেন। তাঁরা মানুষের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন যে বহির্বিজ্ঞান-এর ক্ষেত্রে বাহ্য বিষয়কে মন দ্বারা একাগ্র করতে হয় এবং অন্তর্বিজ্ঞানে মনের গতিকে আত্মাভিমুখী করতে হয়। সুসংহতজীবন বিন্যাস ভোগ এবং যোগের সমন্বয় ঘটাতে পারে। কর্ম এবং যোগের সমন্বয় ঘটাতে পারে। ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতি আজ পর্যন্ত একটা তরবারিও পৃথিবী দখল বা মানুষ হত্যার উদ্দেশ্যমূলক কাজে ব্যবহার করেনি। কারণ ভারতীয় সংস্কৃতি প্রতিরোধ করতে জানে।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষ কর্ম, যোগ ও কর্মযোগ-এর মাধ্যমে সুসংহত জীবনবিন্যাসের এক পরম্পরাগত অভ্যাস তৈরি করতে পেরেছে। আজ আমেরিকার প্রায় এক কোটি মানুষ ভারতীয় যোগচর্চার অভ্যাসে আপ্লুত। অথচ আমরা হেলায় এই অভ্যাসকে হারাচ্ছি।

রংপুর নিলফামারি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপান্দ পরমহংসদেব যা জানিয়েছিলেন (অ-সং/উ-বা. পঞ্চদশ খণ্ড, সন ১৩৬১ সাল, পৃ. ১০৬-১০৮) তা এখানে উপস্থাপন করা হলো— ‘‘কর্ম যোগের জন্য, যোগ কর্মের জন্য; শুধু কর্মের জন্য কর্ম নয়, শুধু যোগের জন্য যোগ নয়। মনে রাখিতে হইবে— কর্ম ছাড়া জীবের অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব। তাই কর্ম প্রতিজনের পক্ষেই বাধ্যকর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই কর্মকে যোগে রূপান্তরিত করিয়া লইবার কৌশল মানুষের আয়ত্ত। কোনো কর্মই যে করিবে না, তাহাকে অন্তত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও তো ছাড়িতে হইবে! কর্মযোগী ইহাকেই যোগে পরিণত করিয়া লন। ইচ্ছা করিলেই মানুষের প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রতিটি প্রশ্বাস মানুষের যোগ-সাধনার অঙ্গরূপে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। যে নিজে পরিশ্রম করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিবে না, তাহাকে অন্যের

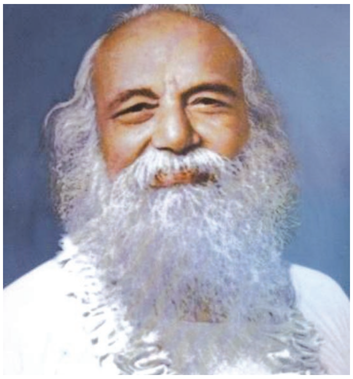

শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ।

পরিশ্রম-লব্ধ হইলেও অন্নগ্রহণ করিতেই হইবে। নতুবা প্রাণ বাঁচিবে না। এই আহারীয়-গ্রহণকেও ইচ্ছা করিলেই যোগে পরিণত করিয়া লইতে পারা যায়। সংসারের সকল লোকেই যতীর ব্রত লইয়া সংসার ত্যাগ করিবে না, সংসারে থাকিয়াও সকলেই আমৃত্যু ইন্দ্রিয়-সংযমী হইয়া বাস করিবে না,— করিলে সৃষ্টি লোপ পাইবে। কিন্তু এই সৃষ্টিরক্ষারই প্রয়োজনে নরনারীর যেটুকু ইন্দ্রিয়-ব্যবহার, তাহাকেই ইচ্ছা করিলে যোগে পরিণত করিয়া লওয়া যায়। যোগ কি? যাহা করিলে ভগবানের সঙ্গে জীবের মিলন-পথ খুলিয়া যায়। ভোগ কি? যাহা করিলে ভগবান হইতে মানুষ দূরে সরিয়া আসে, রক্ত-মাংস-মেদ- মজ্জাকেই চরম ও পরম সত্য বলিয়া মনে হয়। কেহ যদি ভোগের চর্চা করিবার কালেও ভোগকে, ভোগাঙ্গক্রিয়া সকলকে, ভোগলিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এবং ভোগজ শারীর মানস সকল অবস্থাকে ভগবানের সহিত আন্তর-যোগ-সাধনা করিবার উপায় রূপে গ্রহণে কুণ্ঠিত না হয়, তবে তাহার ভোগাচারকে ভোগের অপবাদ হইতে মুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পৃথিবীতে নানা দেশে নানা সময়ে ধর্মের অনুষ্ঠানের সহিত ভোগের জঘন্য আচরণ সমূহকে জড়াইয়া এমন বীভৎস ব্যাপারে পরিণত করা হইয়াছে যে, আজ সাধারণ মানুষ ভোগের সহিত যোগের মিলনকে একটা অসম্ভব ব্যাপার বা অসুন্দর জিনিস বলিয়া মনে করিতেই প্ররোচিত হয়। কিন্তু ভারতে ভোগেন্দ্রিয়াদির ব্যবহার লইয়া যোগের যে অনুশীলন হইয়াছিল, তাহা আভ্যন্তর প্রকৃতিতে, অন্তর্গত উদ্দেশ্যে ও পরিণামে অন্যান্য দেশের ধর্মের নামে ভোগচর্চার অপচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছিল। ভারত ভোগেন্দ্রিয়ের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করিয়াছিল, যেমন সে ভগবানকে দেখিয়াছে প্রতি জীবে, প্রতি অণু-পরমাণুতে। তাহার ভগবদ্দর্শন কেবল মঠে ও মন্দিরে নহে, কেবল তীর্থে ও তপোভূমিতে নহে, কেবল গুরুগৃহে আর নিভৃত পর্বতকন্দরে নহে, তাহার ভগবদ্দর্শন জগতের প্রতি স্থানে, প্রকাশ্য ও সংগুপ্ত সকল মানুষ, পশু, পক্ষীও কীটপতঙ্গের প্রতিটি অঙ্গে। ভগবানকে ভাগ করিয়া ভারতবর্ষ দেখিতে চাহেও নাই, পারেও নাই। বৈদিক ঋষির সর্বাত্মক ব্রহ্মবাদ ভারতের প্রতিটি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সাধন-সম্প্রদায়ে এমনই ভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে যে, ধর্ম পালন করিবার জন্য অশ্লীলতার অনুশীলন করিবার অবকাশ যতটা সে পাইয়াছে, স্বাভাবিক জীবনের অশ্লীলতাকে ধর্মে রূপান্তরিত করিবার জন্য প্রেরণা তাহার অপেক্ষা অধিক তাহার নিকট আসিয়াছে। এই কারণেই পৃথিবীর সকল দেশ হইতে সকল গোপন সাধন-পথগুলি লোপ পাইয়া সাগরজলে ডুবিয়া গেল কিন্তু উলঙ্গিনী শ্যামা এখনো দীপান্বিতায় পরিপূজিতা। তান্ত্রিকের সাধনা সকলের জন্য নহে কিন্তু তন্ত্র সেই সত্যকে প্রকাশ করিয়াছে, যাহাকে রূপ-দান প্রতি গৃহস্থের পক্ষেই ভারতে সহজ। কারণ প্রতি কর্মকে যোগে রূপান্তরিত করিতে হইবে, ইহাই তাহার স্বাভাবিক সাধন। যাহা করিবেই করিবে,— ভাল হউক, মন্দ হউক, ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, প্রকাশ্য হউক, গোপন হউক,— তাহাকে ঈশ্বর-লাভের উপায়ে রূপ দান কর। ইহাই কর্ম-সুকৌশল, ইহাই যোগ।’’

মানুষকে যোগ্যভাবে যোগ্যতার অনুশীলন করতে হবে। যোগ্যতার অনুশীলন তৈরি করবে জীবনবিন্যাস এবং তার থেকেই আসবে অনায়াসলব্ধ এক পরম্পরাগত অভ্যাস। এটাই ভারতবর্ষের গর্ব। ভারতবর্ষের অনুশীলন শক্তির প্রতি বিশ্বের শ্রদ্ধা আজও কুণ্ঠাহীন। কারণ বিশ্ব জানে ভারতবর্ষের সমস্ত কর্মই নিজস্ব স্বাভাবিক সাধন। ■

অঙ্গনা

মহারানি পদ্মাবতী

একজন স্থিরপ্রতিজ্ঞ, আপোশহীনা নারী

সুতপা বসাক ভড়

আমাদের দেশে সবসময়ই কিছু না কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রথমে কোনো ঘটনার সূত্রপাত হয় বা ঘটনাটি ঘটে থাকে। এই ক্রিয়ার পরেই শুরু হয়ে যায় তীব্র প্রতিক্রিয়া। ঘটনার পক্ষে-বিপক্ষে মতামতের বন্যা বয়ে যায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, আমরা মূল বিষয়টি থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। সাম্প্রতিককালে চিত্র পরিচালক সঞ্জয়লীলা বনসালি পরিচালিত নির্মীয়মাণ চলচ্চিত্র পদ্মাবতীকে ঘিরে এমনই বিতর্ক চলছে। ঐতিহাসিক কাহিনিভিত্তিক চলচ্চিত্রায়ণের সময় অনেক ক্ষেত্রেই চিত্রপরিচালকদের মধ্যে অর্থনৈতিক লাভের আশায় ঐতিহাসিক কাহিনির বদল করে চলচ্চিত্রটি বাজারে পেশ করার প্রবণতা দেখা যায়। তারা চলচ্চিত্রের রোমান্টিক নায়ক-নায়িকার প্রেমকাহিনির চিত্রায়ণকে ঐতিহাসিক সত্যতার ওপরে স্থান দিয়ে থাকেন। ফলস্বরূপ, তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভান্বিত হয়ে বক্স অফিসের সাফল্যে মাথার ঠিক না রেখে এমন সব চরিত্রের বদলে উদ্যমী হন, যা আমাদের ঐতিহ্য, গৌরব এবং আত্মমর্যাদার প্রতীক। তাদের এই প্রবণতার সঙ্গে পরিচিত কিছু কিছু সংস্থা, এরকম কিছু আশঙ্কা করে নির্মীয়মাণ চলচ্চিত্রের সেটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরিচালক এবং ওই চলচ্চিত্রের কলা-কুশলীরা ক্ষুব্ধ হয়। পরে অন্য পরিচালক জানিয়েছেন যে চলচ্চিত্রটিতে রানি পদ্মাবতী এবং আলাউদ্দিন খিলজির মধ্যে কোনো প্রেমের দৃশ্য চিত্রায়ণ করা হবে না।

এই নিয়েও রাজনৈতিক মহলে ভোটের লাভ ওঠাবার প্রবণতা দেখা দিল। কেউ বললেন, চিত্র পরিচালকের কাজে হস্তক্ষেপ, কেউ আরও একটু এগিয়ে বললেন, রানি পদ্মাবতীর চরিত্রটি কাল্পনিক; অনেকে আবার বললেন, হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা ছবিটি তৈরিতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে; সুবিধা বুঝে গৈরিক সন্ত্রাসবাদের দোহাই দিয়ে ভোট টানার চেষ্টা করতেও কেউ কেউ পিছু হটলেন না। আজকালকার প্রজন্মের অনেকেই হয়ত চিতোরের মহারানি পদ্মাবতীর কথা জানে না— সেক্ষেত্রে একবার চলচ্চিত্র বানিয়ে আসল ঘটনার বদল করে সমাজের সামনে পরিবেশন করে বক্স অফিসের লাভ করতে পারলেই চিত্র পরিচালকের পোয়াবারো, তাছাড়া আমরা জানি চলচ্চিত্র মনের ওপর ভীষণ ছাপ রাখে। তখন ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে পরিবেশিত অসত্য ঘটনাবলী সত্য হিসেবে মানতে আরম্ভ করি। সেজন্য চিত্রপরিচালকের সত্য ঘটনা পরিবেশন করার দায়িত্ব থাকা উচিত। রাজস্থানের স্থানীয় জনগণ সেজন্য চলচ্চিত্রটিতে তাঁদের সম্মানীয়া নারী পদ্মাবতী চরিত্রের বিকৃতির আঁচ পেয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। প্রত্যেক দেশবাসীর তাঁদের এই পদক্ষেপের সম্মান করা উচিত।

ষোড়শ শতাব্দীর কবি মালিক মহম্মদ জায়সির লেখা পদ্মাবত-এ রানি পদ্মাবতীর চরিত্রটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। চিতোরের রাজা রতন সেনের দরবারের এক কবির মাধ্যমে আলাউদ্দিন খিলজি, রানি পদ্মাবতীর অপরূপ সৌন্দর্যের খবর পায়। খিলজি রানির সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এরপর সে সৈন্যসামন্ত নিয়ে চিতোর গড় ঘিরে ফেলে এবং নিজের হারামের জন্য রানিকে দাবি করে। রানি এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে বিবশ হয়ে খিলজিকে আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখার অনুমতি দেন। রানির ওই প্রতিবিম্ব দেখে খিলজির লালসা আরও বেড়ে যায়। সে তখন চিতোর গড়ে আবার আক্রমণ করে। রাজা রতন সেনকে বন্দি করে। তখন তাঁর কুশলী সেনাবাহিনী পালকি করে রানি পদ্মাবতীকে পাঠানোর অজুহাতে রাজাকে মুক্ত করে নেয়। এদিকে খিলজি উন্মত্ত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে চিতরগড়কে ঘিরে রাখে। দুর্গের ভেতর খাবার শেষ হলে চিতোরের বীর সৈনিকরা দুর্গের বাইরে বেরিয়ে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যু বরণ করে। রানী পদ্মবতীর সঙ্গে অনেক মহিলারা দুর্গের ভেতর জহর ব্রত করেন। আলাউদ্দিন খিলজি যখন রানি পদ্মাবতীকে পাওয়ার আশায় দুর্গের ভেতর ঢোকে, তখন সেখানে রানী পদ্মাবতী নয়, কেবলমাত্র দেহাবশেষের ভস্মমাত্র ছিল। —এই হলো বীরাঙ্গনা রানি পদ্মাবতীর আত্মত্যাগের কাহিনি। চিতোরগড়ে ওই আয়না এবং জহর ব্রত করার জায়গা এখনও আছে।

আজ বামপন্থী এবং উদারবাদী বুদ্ধিজীবীরা নারী পদ্মাবতীর ঘটনাকে কাল্পনিক প্রেম কাহিনি বলে প্রচার করতে চান। তাদের জানাতে চাই, এখনও পাকিস্তানে হিন্দু যুবতীদের কেনা-বেচা নির্বিবাদে চলে। আবার বাংলাদেশ সরকার তো দুষ্কৃতিকারীদের সঙ্গেই নির্যাতিতা মহিলার বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আইন করতে যাচ্ছে। এইসবের মধ্যে আমরা আলাউদ্দিন খিলজিরই প্রতিবিম্ব দেখি, যে শুধুমাত্র নিজের যৌন লালসা মেটাবার জন্য চিতোরগড় আক্রমণ করে, ফলে মহারাজা রতন সেন সমেত হাজার হাজার বীর সৈনিক যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে এবং অন্যান্য বীর নারীদের সঙ্গে মহারানি পদ্মাবতী জহর ব্রত করে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন।

মৃত্যু পর্যন্ত নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল রানি পদ্মাবতীর চরিত্রের গরিমা ক্ষুণ্ণ হলে হিন্দুমাত্রই বিচলিত হবে, প্রতিবাদ করবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং যা সত্য তাকে সম্মান জানিয়ে চলচ্চিত্র বানালে ক্ষতি নেই, কিন্তু বক্স-অফিসের লাভের আশায় পদ্মাবতীর মতো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বীর নারীর অবমাননা মেনে নেওয়া যায় না। ■

প্রোস্টেট ক্যানসার ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

অনেক পুরুষেরই প্রোস্টেট ক্যানসার হতে পারে। তবে এটাও ঠিক প্রোস্টেটের সমস্যা মানেই ক্যানসার নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক সময়েই প্রোস্টেট ক্যানসারের সেরকম মারাত্মক কোনো উপসর্গ থাকে না। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দেখলে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যেমন ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, একবারে প্রস্রাব পুরোটা না হওয়া, প্রস্রাব করে আসার কিছুক্ষণ পরে মনে হলো আবার বাথরুমে গেলে ভালো হয়। প্রস্রাবের গতি কমে যাওয়া বা খানিকটা হওয়ার পর আর না হওয়া। রাতে প্রস্রাবের সমস্যা বেশি হওয়া, কোমর, শিরদাঁড়া, হাড়ে ব্যথা, এমনকী ক্যানসার যদি মারাত্মক পর্যায়ে চলে যায়, তাহলে প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত পর্যন্ত বেরোতে পারে। মনে রাখবেন, প্রোস্টেট ক্যানসারের ক্ষেত্রে বয়স একটা ফ্যাক্টর, বিশেষ করে যাঁদের পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে তাঁদের তো পঞ্চাশের পরই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আসলে প্রোস্টেট ক্যানসার অনেক সময়েই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছলে হাড়ে ছড়িয়ে পড়ে। তখন কোমর বা তৎসংলগ্ন এলাকার হাড়ে প্রবল যন্ত্রণা হতে পারে। সেই যন্ত্রণার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে আসল কারণ। প্রোস্টেটের সমস্যার আরও একটি লক্ষণ হলো সহবাসের সময় নানা ধরনের অসুবিধা হওয়া। প্রোস্টেট ক্যানসারের অন্যতম কারণ প্রোস্টেটের বিশেষ কিছু কোষের পরিবর্তন এবং ডিএনএ'র কারণে কোষগুলির স্বাভাবিকের তুলনায় আরও বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি এবং ছড়িয়ে পড়া। অস্বাভাবিক কোষগুলো বেঁচে থাকে আর স্বাভাবিক কোষগুলি ক্রমশ মরে যায়। এই অস্বাভাবিক কোষগুলো থেকে টিউমার হয়ে আশপাশের কোষগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। কিছু কিছু অস্বাভাবিক কোষ মানে ক্যানসারাস কোষ ফেটে গিয়ে শরীরের অন্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। আসলে প্রোস্টেটের আয়তন বেড়ে গিয়ে মূত্রথলির উপর চাপ পড়ে বলেই যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত হয়। স্থূলত্ব, পারিবারিক ইতিহাস এবং অতিরিক্ত পরিমাণে ভাজাভুজি, তেল, মশলাদার

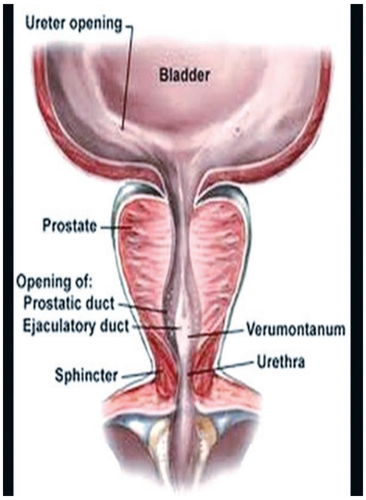

খাবার খেলে ক্যানসারের সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়।

প্রোস্টেট ক্যানসার যে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে তা আগেই বলেছি। বিশেষ করে ইউরিনারি ব্লাডারে। রক্ত প্রবাহ বা লিম্ফোটিক সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে শরীরের অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় হাড়ে ছড়িয়ে গেলে হাড় ভেঙে যাওয়ারও যন্ত্রণা থাকে। প্রোস্টেট ক্যানসার হয়েছে কিনা কয়েকটি পরীক্ষা করে জেনে নেওয়া যেতে পারে। সেগুলো—ডিজিট্যাল রেকটাল এগজামিনেশন। এছাড়া প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন বা পিএসএ টেস্ট। হাতের ধমনী থেকে রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। পিএসএ'র মাত্রা চার পর্যন্ত থাকলে বুঝতে হবে সমস্যা নেই। কিন্তু চারের উপরে হলে বুঝতে হবে প্রোস্টেটের সমস্যা আছে। তবে এর মানে ক্যানসার নয়। ক্যানসার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ভাবে জানার জন্য অ্যালট্রাসোনোগ্রাফি বা প্রোস্টেটের টিস্যু থেকে প্রোস্টেট বায়োপসি করা যেতে পারে। প্রোস্টেট ক্যানসার শরীরে কতটা ছড়িয়েছে সে বিষয় নিশ্চিত হতে এম আর আই, সিটি স্ক্যান, পেট সিটি স্ক্যান ইত্যাদি করে নিশ্চিত হতে হবে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা লক্ষণনির্ভর চিকিৎসা। তাই লক্ষণ অনুযায়ী যে-কোনো ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। আমি যে সমস্ত ওষুধগুলি ব্যবহার করে সুফল পেয়েছি, যেমন--- ক্যান্থারিস, কারসিনোসিন, ফেরাম পিক, চিমাফিলা, স্যাবল সার, হিপার সালফ, বারবারিস ভালগারিস, জুমনিসপার, প্রেট্রোসোলিয়াম প্রভৃতি। তবে কখনই পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ঔষধের শক্তি নির্ধারণ করে থাকেন যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রশিক্ষণ বর্গ

মহিলা সংগঠন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির গ্রীষ্মকালীন শিবির (প্রবেশ— দক্ষিণবঙ্গ, প্রবোধ— উত্তরবঙ্গ) ২০ মে শুরু হয়ে ৫ জুন পর্যন্ত চলবে। শুল্ক ৫৫০ টাকা। স্থান— আমতলা, বারুইপুর রোড, থানা— বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

প্রতি বছরের মতো রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ১৫ দিনের বার্ষিক প্রশিক্ষণ বর্গ (১ম ও ২য় বর্ষের) ১ থেকে ১৬ জুন উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষার্থীদের শুল্ক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা। ১৪ বৎসর বয়স্কা বা তদূর্দ্ধ যে কোনো মা-বোন প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। যোগাযোগের ঠিকানা : প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ— ৯৪৩২৩৬৩১৭৯, মুক্তিপ্রদা সরকার— ৯৪৩৪৮৭৭০৯৭, ঋতা চক্রবর্তী— ৯৮৩০৫৭১৯৭৩।

কলেজ-শিক্ষকের বদান্যতা
উদ্বৃত্ত খাবারে গরিবের অন্নসংস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নগরায়ণ যত বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বর্জ্য। এই বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত খাবার। ভারতের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ মানুষ দু'বেলা ঠিকমতো খেতে পান না। এই পরিস্থিতিতে এত খাবার নষ্ট হলে তা আর্থিক এবং সামাজিক অপরাধের শামিল হয়ে পড়ে। তাছাড়া ফেলে দেওয়া খাবার পচে গেলে যে মিথেন গ্যাসের সৃষ্টি হয় তা গ্রিনহাউস গ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশকে মারাত্মক দূষিত করে মিথেন।

পথশিশুদের নিজের হাতে খাওয়াচ্ছেন চন্দ্রশেখর কুণ্ডু।

চন্দ্রশেখর কুণ্ডু আসানসোলের বাসিন্দা। আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনা করেন। একদিন কলেজ ক্যান্টিনে খেতে গিয়ে নেহাতই কাকতালীয় ভাবে ফেলে দেওয়া খাবারের ছোটখাটো পাহাড়টা তিনি দেখে ফেলেছিলেন। দেখে চমকেই উঠেছিলেন বলা যায়। ক্যান্টিনের এক কর্মী তাঁকে জানিয়েছিল, হোটেল-রেস্টুরেন্টে এর থেকে আরও অনেক বেশি খাবার ফেলা হয়।

বস্তুত এই ঘটনার পরেই তিনি গঠন করেন ফুড এডুকেশন অ্যান্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট, সংক্ষেপে ফিড। এদের কাজ আশেপাশের ক্যান্টিন, হোটেল, রেস্টুরেন্টে ঘুরে ঘুরে উদ্বৃত্ত খাবার সংগ্রহ করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফিডের কর্মীরা উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করেন না, কেউ স্পর্শ করেনি এরকম খাবারই তারা নেন।

চন্দ্রশেখর কুণ্ডু বলেন, 'আমাদের সকলের পেট ভরে খাওয়ার অধিকার আছে কিন্তু খাবার নষ্ট করার অধিকার কারও নেই। যেহেতু আমরা সকলের মুখে খাবার তুলে দিতে পারি না, তাই আমাদের এমন কিছু করা উচিত যাতে একসঙ্গে অনেক মানুষ উপকৃত হন।'

কিন্তু সংগৃহীত খাবার কীভাবে পৌঁছয় গরিবদের কাছে? আসানসোলের প্রায় সব ক্যান্টিন-হোটেল-রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার সংগ্রহ করেন চন্দ্রশেখর কুণ্ডু এবং তাঁর ছাত্ররা। তারপর তা দুঃস্থ- গরিবদের কাছে পৌঁছে দেন। এদের বেশিরভাগই রাস্তার ভিখিরি, নয়তো ভবঘুরে। সপ্তাহে চারদিন ফুডক্যাম্প খোলা হয়। সেখান থেকে এরা খাবার নিয়ে যান।

আজকাল এই ধরনের কাজ কেউ করলে আগে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খোলেন। চন্দ্রশেখরবাবু এসবে উৎসাহী নন। ইতিমধ্যেই তাঁর কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে দুটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি হয়েছে। এছাড়া রয়েছে মানুষের মুখে-মুখে প্রচার। কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর 'সেভ ফুড মিশন' সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

নতুন প্রজন্মও এমন একটি উদ্যোগের পাশে থাকতে উৎসাহী। চন্দ্রশেখর কুণ্ডু নিজে শিক্ষক। সহকর্মী হিসেবেও তিনি পছন্দ করেন ছাত্রদের। আই আই টি খড়্গপুরের ছাত্ররাও চন্দ্রশেখরবাবুর অনুপ্রেরণায় শুরু করেছে খাবার নষ্ট না হতে দেবার প্রয়াস। সেখানকার ছাত্ররা ক্যান্টিনে বাড়তি খাবার তৈরি হতেই দিচ্ছে না। চন্দ্রশেখরবাবু পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এই ব্যবস্থা চালু করতে চান।

রেস্টুরেন্ট বা ক্যান্টিন মালিকদের পাশাপাশি আসানসোলের কেটারিং সংস্থাগুলিও চন্দ্রশেখরবাবুর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। যদি কোনো বিয়ে বাড়িতে খাবার বেঁচে যায় তাহলে তারা শুধু ফিডের স্বেচ্ছাসেবকদের ফোন করে দেন। তারা এসে খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে যান।

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য আন্দোলন দেখেছে। কিন্তু খাবার বাঁচাও আন্দোলন দেখেনি। চন্দ্রশেখর কুণ্ডুরা তাই করছেন। অপচয় বন্ধ করে অন্নহীন মানুষের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছেন। এর থেকে বড়ো সেবা আর কীই বা হতে পারে। আশা করা যায় প্রিয় শিক্ষকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর ছাত্ররা আরও বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসবেন। ■

দিল্লি, মুম্বই মাতিয়ে এলো বাংলার মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গল নাটকের একটি দৃশ্য।

বিকাশ ভট্টাচার্য

দেশের সর্ববৃহৎ নাট্যোৎসব কেন্দ্রীয় সরকার আয়োজিত ভারত রঙ্গমহোৎসব ১ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে গেছে। দিল্লিতে হলো ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। দেশের বিভিন্ন শহরে এখনও উৎসব চলছে। এবার উৎসবে দেশ-বিদেশের মোট ৯৪টি নাটক স্থান পেয়েছে। দেশের সব নাট্যদলই চায় তাদের নাটক নিয়ে দিল্লি পাড়ি দিতে। নাটকের সিডি তৈরি হয়, পাঠানো হয়, বাছাইপর্ব চলে। দেশের তাবড় নাট্যকর্মীকে নিয়ে এত বড় আয়োজন এর আগে আর হয়নি। যদিও ভারত রঙ্গ মহোৎসব চলবে বেশ কয়েকবছর ধরে। এবারের উৎসবে ১৪টি বিদেশি নাটক আছে। ১২টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে এই মহতী নাট্যোৎসবে। এবার কেন্দ্রীয় থিম ধরে নেওয়া হয়েছে— ‘‘আমার নাট্য আমার মতো।’’ আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা এবছর প্রথম সাহায্য পাচ্ছে ওয়ার্ল্ড থিয়েটার ফোরাম এবং ইউনেস্কোর। এ বছর যেসব দেশ অংশ নিল তারা হলো ইংল্যান্ড, রাশিয়া, ইতালি, ইজরায়েল, টার্কি, আফগানিস্থান, তাজিকিস্তান, রোমানিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও বাংলাদেশ। একটি বিশেষ সেমিনার ছিল— ‘‘অ্যাক্টর অ্যাট ভানিশিং পয়েন্ট’’। প্রতি বছরের মতো এবারও প্যারালাল উৎসব হবে ৫টি প্রদেশে। কুরুক্ষেত্র, আগরতলা, পাটনা, পুনে ও হায়দরাবাদে।

এবার উৎসবের ৯৪টি নাটকের মধ্যে বাংলা থেকেই গেছে ১৩টি নাটক। তার মধ্যে নান্দীপটের ‘মনসামঙ্গল’ অন্যতম। নান্দীপট বাংলার সুপরিচিত নাট্যদল। বহির্বঙ্গেও এর জনপ্রিয়তা আছে। তাদের এবারের প্রযোজনা বিষয় বৈচিত্র ও উপস্থাপনার গুণে ইতিমধ্যেই সকলের নজর কেড়েছে। পরিচালক প্রকাশ ভট্টাচার্য এই লোকজ কাহিনিকে বিরাট ক্যানভাসে নাচেগানে অভিনয়ে সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। ‘মনসামঙ্গল’ মধ্যযুগের বাংলায় সাহিত্যকর্ম। নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় তুলনামূলক ভাবে জনপ্রিয় কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচনাটিকে তাঁর নাটকের উপজীব্য করেছেন। ইতিপূর্বে শম্ভু মিত্রের রচনা ‘চাঁদবণিকের পালা’-তে চাঁদ সদাগর উন্নত চরিত্রের মানুষ। যে কিনা তখনকার সমাজের অচলনশক্তির বিরুদ্ধে নৌকা ভাসায়। নান্দীপটের নাটকের চাঁদ নানান দোষে দুষ্ট। মনসা তাকে লাস্যময়ী নারীর বেশে এসে মনোহরণ করে এবং কামার্ত চন্দ্রধর হারায় তার মহাজ্ঞান। মনসা যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে পাগলিনী, চাঁদ তেমনই অহংবোধে আচ্ছন্ন। বেহুলার ভাগ্যবিড়ম্বনা তাই মনসা ও চাঁদের কলহের ফল। বেহুলা এই নাটকে অযৌক্তিক কলহের বিরুদ্ধে জাগ্রত এক একাকী নারী। তাই এই নাটক বেহুলারই নাটক।

অনেকদিক থেকেই নান্দীপটের এ নাটক মনে রাখার মতো। এত শিল্পী নিয়ে সম্পূর্ণ মঞ্চ জুড়ে নাচেগানে অভিনয়ে মাতিয়ে রাখা সোজা কথা নয়। লাইভ মিউজিক, কোরিওগ্রাফি এক কথায় অনবদ্য। দলগত অভিনয় দেখার মত। আর এইসব কারণেই দিল্লি, মুম্বই বা বহির্বঙ্গে ‘মনসামঙ্গল’ এতটা প্রশংসা পেয়েছে। দিল্লিতে ১১ ফেব্রুয়ারি এবং মুম্বইতে ৫ মার্চ এ নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। বহির্বঙ্গের দর্শক বাংলার ‘মনসামঙ্গল’ দেখে আপ্লুত।

মনসামঙ্গলের জনপ্রিয়তা এবার বহির্বঙ্গেও।

দেশ সবার আগে

ভারত তখন ইংরেজদের হাতে পরাধীন। বিদেশি শাসনে ভারতীয়রা নিজেদের গৌরবের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। সবসময় শুধু হীনমন্যতায় ভুগতো। সেরকম পরিস্থিতিতে স্বামী আয়োজন করা হল। এরই ফাঁকে তাকে অনুরোধ করা হলো সেখানকার ছাত্রদের সামনে কিছু বলার জন্য। স্বামী রামতীর্থ তাতে সম্মতি দিলেন।

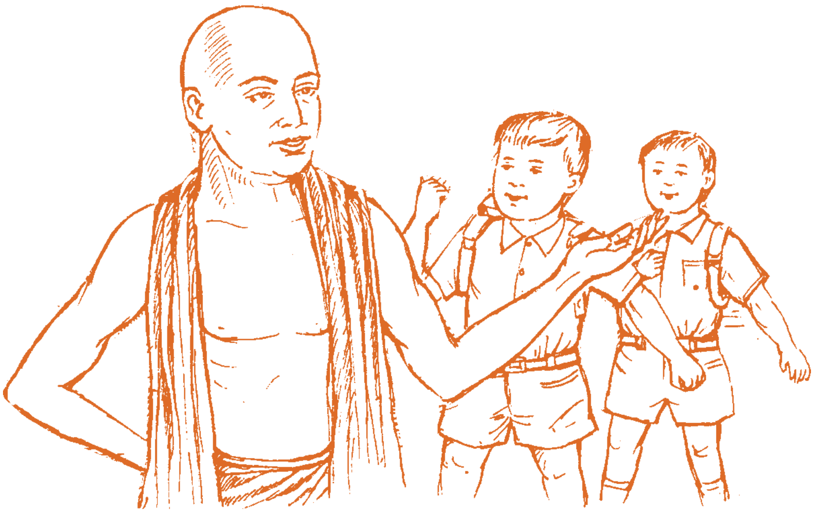

বিবেকানন্দ বিদেশে গিয়ে ভারতীয়দের গৌরবের কথা প্রচার করে আসেন। তারপর স্বামী বিবেকানন্দের মতো আরও এক তরুণ সন্ন্যাসী পাশ্চাত্যে হিন্দুধর্ম প্রচার করতে যান। তাঁর নাম স্বামী রামতীর্থ। তিনি পাশ্চাত্যের নানা দেশ পরিভ্রমণ করে এসে পৌঁছন জাপানে। স্বাভিমানী জাপানিরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালো। রামতীর্থ যেখানেই যেতেন সেখানেই ভারত বিষয়ে তাঁর নানা বক্তৃতার আয়োজন করা হোত। পরাধীনতার গ্লানিকে উপেক্ষা করে তিনি হিন্দুধর্মের মহান কথাগুলিকে বিশ্ববাসীকে শোনাতেন। জাপানেও এরকম অনেক বক্তৃতার

একটি স্কুলে আয়োজন করা হলো সেই আলোচনাসভার। স্বামী রামতীর্থ সেই স্কুলে গেলেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে নানা কথা বলতে লাগলেন। বহু ছাত্র তাতে অংশ নিয়েছে। একজন ছাত্রকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন— তুমি কোন ধর্মকে মানো?

ছাত্রটি বলল— আমরা বৌদ্ধধর্ম মানি।

রামতীর্থ বললেন— তাহলে গৌতম বুদ্ধকে তুমি কী মনে কর?

ছাত্রটি বলল— তিনি ভগবান।

এরপর রামতীর্থ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের নাম শুনেছো?

ছাত্রটি বলল— হ্যাঁ শুনেছি, তিনি একজন মহান মানুষ।

রামতীর্থ ছাত্রটির সঙ্গে খুব স্নেহভরে কথা বলছিলেন। ছাত্রটিও তাঁর সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল। এবার রামতীর্থ ছাত্রটিকে বললেন— ভগবান বুদ্ধ ও কনফুসিয়াস কেউ তোমাদের দেশের লোক নয়। তবু তোমরা তাকে ভগবান মনে কর, শ্রদ্ধা কর। কিন্তু, ভগবান বুদ্ধ আর কনফুসিয়াস দুজনে মিলে যদি তোমাদের দেশ জাপান আক্রমণ করে, তখন তুমি কী করবে?

এই কথা শুনে ছাত্রটির মুখ লাল হয়ে গেল, চোখে ক্রোধের আগুন দেখা দিল। রাগান্বিত হয়ে সে উত্তর দিল— সবার প্রথমে আমি তরবারি দিয়ে ভগবান বুদ্ধের মুণ্ডচ্ছেদ করবো। তারপর, আমার বুট দিয়ে আমি কনফুসিয়াসকে থেঁতলে দেবো।

ছাত্রটির এই উত্তর শুনে স্বামী রামতীর্থ খুব খুশি হলেন। তিনি আগেই শুনেছিলেন জাপানি নাগরিকরা খুব দেশভক্ত। সেই ছাত্রের মাধ্যমে তিনি সেদিন তা প্রত্যক্ষ করলেন এবং বললেন— যে দেশের ছাত্ররা এরকম দেশপ্রেমিক হয়, যাদের কাছে ধর্মের চেয়ে দেশ বড়, সেই দেশকে কোনোদিন কেউ পরাধীন করতে পারে না। সত্যিই তাই, জাপানকে কেউ কোনোদিন পরাধীন করতে পারেনি। পৃথিবীর মধ্যে জাপান আজ উন্নত দেশ হিসেবে পরিগণিত। *(সংগৃহীত)*

রাজ্য পরিচিতি

দমন ও দিউ

ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দমন ও দিউ। এদু'টি একসময় পর্তুগিজদের অধীনে ছিল। পর্তুগিজদের হাত থেকে উদ্ধার হওয়ার পর তাকে ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দেওয়া হয়। প্রথমে গোয়া, দমন ও দিউ মিলে একটি কেন্দ্রশাসিত এলাকা ছিল। কিন্তু ১৯৮৭ সালে গোয়া আলাদা হয়ে গেলে দুই জেলা নিয়ে তৈরি হয় দমন ও দিউ। দমন ও দিউয়ের মোট আয়তন ১০২ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৯১১ জন। এখানকার মূল ভাষা গুজরাটি। এছাড়াও কোঙ্কনী ও হিন্দি ভাষাতেও বহু মানুষ কথা বলে। পর্যটনের দৃষ্টিতে দমন ও দিউ খুবই আকর্ষণীয়। এখানকার সমুদ্রসৈকত, নাদিয়া কেভস্, দিউ ফোর্ট দেখতে সারাবছর বহু পর্যটকের সমাগম হয়। এগুলো ছাড়াও এখানকার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানগুলি হলো জৈন মন্দির, টাওয়ার অব সাইলেন্স ইত্যাদি।

এসো সংস্কৃত শিখি

तदहं बहु इच्छामि।

সেটা আমি খুব চাইছি।

कियत् लज्जास्पदम्!

কী লজ্জার কথা!

एषः मम दोषः न।

এটা আমার দোষ নয়।

मम तु आक्षेपः नास्ति।

আমার তো কোনো আক্ষেপ নেই।

सः शीघ्रकोपी।

তিনি সহজেই রেগে যান।

ভালো কথা

দোল উৎসব

দোল উৎসব মানে রঙের খেলা, রঙে মাখামাখি। কিন্তু আমাদের দোল উৎসব একটু আলাদা হলো। আমরা স্বয়ংসেবকরা সেদিন সকাল আটটা নাগাদ পাড়ার মাঠে সবাই হাজির হয়েছিলাম। প্রথমে সেখানে সবাই নিজেদের মধ্যে আবির খেললাম। তারপর কচুরি, মিষ্টি খেয়ে পাড়ায় বেরোনো হলো। রবি ঠাকুরের 'খোল দ্বার খোল...' গান গাইতে গাইতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলাম। পরিচিত যাদের সঙ্গে দেখা হলো তাদের আবির মাখানো হলো। অনেক বাড়িতে যাওয়া হলো। সেখানে বড়দের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করা। সব বাড়িতে কিছু না কিছু খাইয়েছে। কেউ মিষ্টি, কেউ সরবত। আমরা প্রায় পনেরো ষোলো জন ছিলাম। এইভাবে প্রায় বেলা বারোটা পর্যন্ত আমারা দোল উৎসব উৎযাপন করেছি।

অয়ন পাল, সিমলা, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ট শ্চা প প

(২) ল তা গু ম

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ম কৃ অ ত্রি

(২) রি ভ হ দ্রা

১৩ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) নৌকাবিহার (২) নিত্যনতুন

১৩ মার্চ সংখ্যার উত্তর

(১) যোগাসন (২) পারাপার

উত্তরদাতার নাম

(১) বিশ্বনাথ পণ্ডা, বরাবাজার, পুরুলিয়া (২) আলাপন দলুই, রামপুর, হলদিয়া
(৩) প্রীতম মণ্ডল, সিউড়ি, বীরভূম (৪) রূপষা দেবনাথ, বিরাটি, কল-৪৯

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

শব্দরূপ-৮২৮

ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

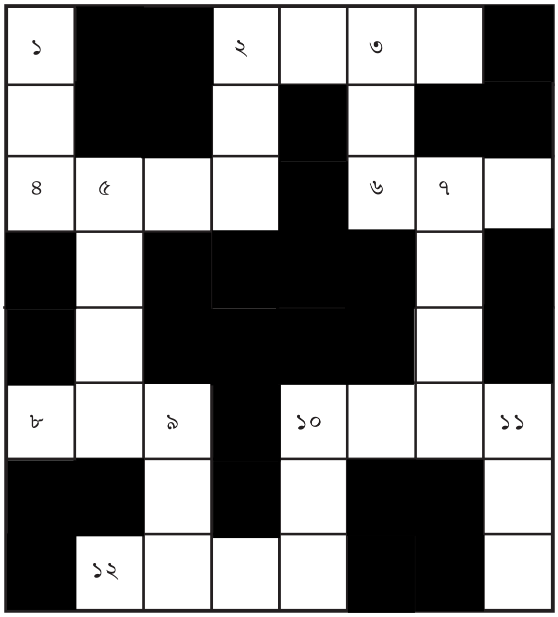

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. সূতিকাগৃহে যে নারী প্রসবকাল হতে প্রসূতির শিশুকে লালন করে, ৪. আকাশে দৃশ্যমান বহুদূরস্থ নীহারপুঞ্জ সদৃশ বাষ্পীয় পদার্থ বা নক্ষত্রসমষ্টি, ৬. রুদ্রবীণা, ৮. বড় এক প্রকার লেবু, ১০. চন্দ্র, ১২. অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহার্থে সম্প্রদান।

উপর-নীচ : ১. দুর্গা, ২. নলখাগড়া, শরফুলের গাছ, ৩. তৃণধান্য, ৫. নতুন বছরের হিসাবের খাতা, ৭. বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, ৯. বিদ্যুৎ, বিজলি, ১০. জনহীন, ১১. সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পক্ষী; গরুড়।

সমাধান
শব্দরূপ-৮২৫
সঠিক উত্তরদাতা

দীপক রঞ্জন দাস
জোড়াঘাট লেন,
চুঁচুড়া, হুগলী
সুশীল কয়াল
তাঁতিবেড়িয়া, হাওড়া

		জ	য়	রা	ম	বা	টি
গ	র	বা				গ	
জ		লা	ল	ন		বা	
ল	হ			ক্র		দি	
	ল		হা			নী	প
	ফ		বা	র্তা	কু		
	না				বে	তা	ল
কা	মা	র	পু	কু	র		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৮২৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৪ এপ্রিল ২০১৭ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ২৭

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর জীবনাবসান

অধ্যাপক তথা গবেষক ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর জীবনাবসান হয়েছে। গত ১২ মার্চ রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে থেকে কলকাতার এক হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বৎসর। অখণ্ড ভারতের ফরিদপুর জেলার মাদারিপুরের পালং গ্রামে ১৯৪৬ সালে তাঁর জন্ম। দেশভাগ ও দাঙ্গার বলি হয়ে তাঁর পরিবার ভারতে চলে আসেন। তখন তিনি আড়াই বছরের শিশু। বাল্যকাল থেকেই মেধাবী ছাত্র। ১৯৭২ সালে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ৪৫ বছর অধ্যাপনার পর ২০১১ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

ড. ব্রহ্মচারী হিন্দুজীবন পদ্ধতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ভারতীয় দর্শন ও ইতিহাসে ছিল তাঁর গভীর অধ্যয়ন। হিন্দুকাল গণনা তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত বই। স্বামী প্রণবানন্দ ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অনুগামী। পাশাপাশি ইসলামিক মনস্তত্ত্ব এবং কোরান ও জিহাদ তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর রচিত 'ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত' বইটির ২০টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল যার সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। তিনি স্বস্তিকার একজন শুধু নিয়মিত লেখকই ছিলেন না, ছিলেন পরম হিতৈষীও। হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সংগঠনগুলি তাঁর অবদানের কথা স্মরণে রাখবে। তাঁর মৃত্যুতে দেশ এক সুসন্তানকে হারাল। শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

সংযোজন : প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী ১৯৯০ সালে কলকাতার সন্তোষপুরে পার্ক টেরেসের কাছে একটি একতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। ওই সময়ে তিনি রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের ফলিত পদার্থবিজ্ঞানের রিডার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সঙ্ঘের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক প্রয়াত ড. ধনঞ্জয় দাসের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর মাধ্যমে সন্তোষপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে তিনি শ্যামলকান্তি সেন (তৎকালীন কলকাতা মহানগর কার্যবাহ), স্বস্তিকার সুধাময় দত্ত, কালিদাস বসু প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন এবং সঙ্ঘের হিন্দু আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ওই সময়ে কল্যাণীর গয়েসপুরে সঙ্ঘের এক বিশাল প্রান্তীয় শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তারা ঠিক করলেন যে তাঁকে ওই শিবিরের সর্বাধিকারী নিযুক্ত করা হবে। সেইমতো তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর তিনি রাজি হয়ে গেলেন। শিবিরে যাওয়ার আগে সন্তোষপুরের কিছু ঘনিষ্ঠ স্বয়ংসেবকদের তিনি বলেছিলেন— 'একবার যদি ভাল লেগে যায় তা হলে তোমাদের মধ্যেই থেকে যাব।' —তা তিনি আমাদের মধ্যেই থেকে গিয়েছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে গিয়েছিলেন। এরপর কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ নগর ভাগ হয়ে সন্তোষপুর প্রণবানন্দ নগরের মধ্যে চলে এল এবং তাঁর বাসাটি আমাদের বৈঠকের একটি জায়গা হয়ে গেল। তাঁর আশ্রয়ে বিধান আকুলি নামে একজন স্বয়ংসেবক বিস্তারক হিসাবে থাকত। বাড়িতে কারখানার কাজে ব্যবহার্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তিনি তৈরি করাতেন। এর মধ্যেই চলত হিন্দুত্ব বিষয়ে পড়াশোনা এবং এই সময়ে তিনি ইসলামের ওপর গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা করতেন। তাঁর ঘরে বিজ্ঞানের বইপত্র ছাড়াও ওইসব বইপত্র ছড়ানো থাকত। তিনি অকৃতদার ছিলেন না। তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। বৃদ্ধা মা তাঁর কাছেই থাকতেন।

বিজ্ঞানের গবেষক থেকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ইসলাম ও হিন্দু ইতিহাসের গবেষক। ইসলাম সম্পর্কে হিন্দুরা যে কত অজ্ঞ সেকথা তিনি বারে বারে বলতেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা— 'ইসলাম, মহম্মদ ও পর্দাপ্রথা' নিজ ব্যয়ে ছাপিয়ে তিনি বিনামূল্যেই বিতরণ করতেন। ■

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
27 March - 2017 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০ টাকা ।।